উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

কোর পত্র ৩০১(আবশ্যিক)

সাহিত্যতত্ত্ব

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় -ক

একক ১ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - ভূমিকা

একক ২ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - রস

একক ৩ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - ধ্বনিবাদ

একক ৪ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব - অলংকার ও রীতি

একক ৫ - প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব – বক্রোক্তিবাদ ও ঔচিত্ত্যবাদ

একক ৬ - অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব

একক ৭ - 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থের অন্যান্য তত্ত্ব

পর্যায় –খ

একক ৮ - রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব - রোমান্টিক যুগ

একক ৯ - রোমান্টিকতার কবি - ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ

একক ১০ - রোমান্টিসিজিম এর অন্যান্য কবিরা - শেলী, কীটস ও বায়রন- রোমান্টিক কবিতা

একক ১১ - রোমান্টিক গদ্য সাহিত্য - স্কট ও ল্যাম্ব

একক ১২ - সাহিত্যের পথে - রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য

একক ১৩ - প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

একক ১৪ - প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

কোর পত্র – ৩০১(আবশ্যিক) সাহিত্যতত্ত্ব

পর্যায়-খ

একক ৮ - রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব রোমান্টিক যুগ - রোমান্টিকতার স্বরূপসন্ধান , রোমান্টিক আন্দোলনে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব , লিরিক্যাল ব্যালাডস : রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের সূচনা , রোমান্টিকতার লক্ষণসমূহ ।

একক ৯ - রোমান্টিকতার কবি - ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ ।

একক ১০ - রোমান্টিসিজিম এর অন্যান্য কবিরা – শেলী ও কীটস, লর্ড বায়রন

একক ১১ - রোমান্টিক গদ্য সাহিত্য - ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট, চার্লস ল্যাম্ব।

একক ১২ - সাহিত্যের পথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, “তথ্য ও সত্য" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব আলোচনায় কল্পনার গুরুত্ব, অনুকরণ তত্ত্বের ভুমিকা।

একক ১৩ - প্রবন্ধ বিশ্লেষণ- বাস্তব, বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা, আধুনিক কাব্য ও আধুনিকতার স্বরূপ বিচার, সাহিত্যের তাৎপর্য ।

একক ১৪ - প্রবন্ধ বিশ্লেষণ- সাহিত্যের সামগ্রী , সাহিত্যের বিচারক, সৌন্দর্যবোধ।

একক ৮ - রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব রোমান্টিক যুগ

বিন্যাসক্রম

৮.১ রোমান্টিকতার স্বরূপসন্ধান

৮.২ রোমান্টিক আন্দোলনে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব

৮.৩ লিরিক্যাল ব্যালাডস : রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের সূচনা

৮.৪ রোমান্টিকতার লক্ষণসমূহ

৮.৫ অনুশীলনী

৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ রোমান্টিকতার স্বরূপসন্ধান

রোমান্টিকতা (Romanticism) তথা রোমান্টিক সাহিত্য আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে এমন একটি সুবিস্তৃত ইউরোপীয় ঘটনা যে, কোনো একটি দেশ বা কালের নির্দিষ্ট সীমারেখায় তাকে বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের যুগ্ম-সংকলন 'লিরিকাল ব্যালাডস'এর আবির্ভাব-লগ্ন থেকে ১৮৩১-এ স্কটের মৃত্যু এবং রিফর্ম বিল প্রবর্তিত হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনায় রোমান্টিকতার স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করা হলেও এ-জাতীয় সময়-প্রকোষ্ঠে সাহিত্যের আলোচনাকে সীমায়িত রাখা সমীচীন বলে মনে হয় না। রোমান্টিক কাব্য তথা সাহিত্য আন্দোলনের পদধ্বনি অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য ও যুক্তির ধ্রুপদি যুগ-পরিবেশেও অশ্রুত ছিলো না। টমসন, গ্রে, বার্নস, ব্লেক প্রমুখের কবিতায় এবং ওয়ালপোল, রেডক্লিফ, লিউইসদের গথিক উপন্যাসে ভাবগত ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনের লক্ষণীয় পূর্বাভাস ছিলো। প্রকৃতিপ্রেম, মানবিকতা তথা আটপৌরে মানবজীবন সম্পর্কে সহানুভূতি ও

আগ্রহ, স্বাধীনতার স্পৃহা, বিষন্নতা, অতিপ্রাকৃত তথা কিম্ভুতের প্রতি আগ্রহ, ভাষা ও কাব্য-রূপ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি অগাস্টান যুগের এইসব কবি লেখকদের রচনায় সহজলক্ষ্য ছিলো। এঁরা ছিলেন সেই অর্থে রোমান্টিক আন্দালনের পূর্বসুরী। কাজেই ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের বাঁক ফেরাকে যদি রোমান্টিকতার যাত্রারম্ভ বলে মনে করি, তাহলে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে সেই যাত্রারম্ভের প্রস্তুতির লক্ষণগুলি বিস্মৃত হলে চলবে না। এ ছাড়াও স্মরণে রাখতে হবে এলিজাবেথীয় যুগের রোমান্টিকতার ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে। সাহিত্যের ইতিহাস মাত্রেই ঐতিহ্য ও বিদ্রোহের এক সম্পর্কযুক্ত ধারাবাহিকতার ইতিহাস।

রোমান্টিকতার স্বরূপ সন্ধানে এত বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে যে তা থেকে সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া মুশকিল। মনে হয়, জেরোম হ্যামিলটন বাকলে (Buckley)-র The Victorian Temper (1951) গ্রন্থের সেই কথাটিই সঠিক 'Romanticism has already passed into the realm of the unknowable.' দু'চার কথায় রোমান্টিকতার সংজ্ঞা বা প্রকৃতি নিরূপণ অসম্ভব, যদিও আলোচনার সুবিধার্থে ওয়ালটার পেটার-এর 'the addition of strangeness to beauty' কিংবা ওয়াট ডানটনের 'The Renascence of Wonder'- জাতীয় কোনো শব্দ-বন্ধ গ্রহণ করা যেতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসকার অ্যালবার্ট রোমান্টিক যুগকে the Return to Nature বলে চিহ্নিত করেছেন।

যুক্তিবাদী দর্শন ও নব্য-ধ্রুপদি (Neo-Classical) সাহিত্যাদর্শের বিপরীতে একটি বিকল্প নন্দনতত্ত্বের সন্ধান ছিলো রোমান্টিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশাসনে শাসিত, যুক্তিগ্রাহ্যতা ও পরিমিতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিল্পসাহিত্য তথা জীবনাদর্শের বিরুদ্ধে এ-ছিলো এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রতিক্রিয়া যার ভিত্তিমূলে ছিলো 'কল্পনা' (imagination])। এই কল্পনা রোমান্টিক কবি-লেখকদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলো শুষ্ক যুক্তিবাদের প্রতিষেধক এক ঐন্দ্রজালিক সৃজনীশক্তিরূপে, আর এই শক্তির বলেই রোমান্টিক কবিমানস জগৎ ও জীবনের গুঢ় অন্তর্লোকে ডুব দিয়েছিলো মহা হিরন্ময় সত্যের খোঁজে। প্রথাসর্বস্বতা থেকে মুক্তি ও প্রকাশের এক আত্মগত ভঙ্গী

যদি এই রোমান্টিক আন্দোলনের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে গণ্য হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে এই আন্দোলনের পূর্বসূচনা হয়েছিলো অষ্টাদশ শতকেরই সত্তর দশকে জার্মানিতে, 'Sturmund Drang' আন্দোলনে, যার মুখপাত্র ছিলেন হার্ডার (Harder), শিলার (Schiller) এবং গ্যেটে (Goethe)। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিকতার যে যুগক্রান্তি উনিশ শতকের প্রারম্ভে আমরা দেখে থাকি তার জামান এবং ফরাসি প্রেরণার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অগ্রজ কবিদের মধ্যে কোলরিজ জার্মান রোমান্টিকতার বিশেষত শিলিং (Schelling) ও শ্লেগেল (Schlegel)-এর ভাব-উপাদান গুলি সম্প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আর ফরাসি বিপ্লবের ঝোড়ো প্রভাব এসে পড়েছিলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, বায়রন প্রমুখের ওপর। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আহ্বানবাণী আর রুশো (Rousseau), ভলতেয়ার (Voltaire)-এর ভাবনাচিন্তা ইংলন্ডের নবপ্রজন্মের মানসমণ্ডলে এক তোলপাড় ঘটিয়েছিল। ১৭৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে ক্রান্তিকারী লেখক টমাস পেইন (Paine)-এর Right of Man গ্রন্থের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হলে সামাজিক শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে ইংলন্ডের সমাজপরিসরে তীব্র ঘৃণা সঞ্চারিত হয়েছিলো। এই ভাবেই একদিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও দার্শনিক মনোভঙ্গী এবং অন্যদিকে ধর্মীয় সামাজিক অনুশানের বিরুদ্ধে রোমান্টিক কবিমানস তার ঈঙ্গিত মুক্তির লক্ষ্যে পাড়ি দিলো এক অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দলোকে, যেখানে ছিলো সেই অপার্থিব আলো— 'the light that never was on sea or land.'
ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার রাহসিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন সকল বস্তুর অন্তর্জীবন' ('the life of things') : অনুভব করলেন :

A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought.
And rolls through all things.

[Tintern Abbey]

পশ্চিম বাতাসে উদ্দাম দাপাদাপির মধ্যে শেলি খুঁজে পেলেন ক্ষয়িষ্ণু, মৃতপ্রায় জীবনের পুনরুজ্জীবনের প্রত্যয়-সংকেত :

Be through my lips unawakened earth

The trumpet of a prophecy! O Wind,

If Winter comes, can Spring be far behind?

[Ode to the West Wind]

এইভাবেই কবি আবির্ভূত হলেন দ্রষ্টা, ভবিষ্যদ্বক্তা ও নবজীবনের বিধায়কের ভূমিকায়।

রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বে 'কল্পনা'-র নিরঙ্কুশ অবস্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ইংলন্ডে প্রভাবশালী ছিলো লক্ (Locke)-এর এমপিরিসিস্ট দর্শন এবং নিউটনীয় বিজ্ঞান। এই আবহমণ্ডলে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতা বা 'কল্পনা'-র কোনো সুযোগ ছিলো না। রোমান্টিকতা ছিলো এই বস্তুতান্ত্রিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার আকাঙক্ষা, যার প্রধান লক্ষণ রূপে দেখা দিয়েছিলো কল্পনা ও সংবেদনশীলতার এক অভূতপূর্ব প্রসারণ। হারফোর্ড (Herford)-এর ভাষায়-'an extraordinary development of imaginative sensibility,' এই সংবেদনশীলতার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রুশোর 'প্রকৃতিবাদ' (Naturalisn) এবং কান্ট থেকে হেগেল পর্যন্ত জার্মান transcendentalism।

ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়ক রুশো সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন করেছিলেন। একদিকে সামন্তবাদী শ্রেণী-সম্পর্ক ও স্বেচ্ছাচারিতার সমালোচনা এবং গণতন্ত্র, নাগরিক অধিকার ও মানুষের সম্মান তথা সমতার কথা বলেছিলেন রুশো, অন্যদিকে আদিম প্রকৃতি-লালিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও অবহিত করেছিলেন, যে অবস্থায় মানুষে মানুষে বিভেদ-বৈষম্য ছিলো না, মানুষ ছিলো প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম। রুশোর প্রকৃতিবাদী দর্শন ও মানবতন্ত্রী চিন্তাভাবনা অনুপ্রাণিত করেছিলো ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের। ব্লেক তার 'Songs of Innocence'-এ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'ode On Intimations of Immortality'-র মতো কবিতায় মানব শৈশবকে দিয়েছিলেন এক আদর্শায়িত উজ্জ্বল রূপ। শেলির The Revolt of Islam *এবং* Prometheus Unbound-এ ধ্বনিত হয়েছিলো মুক্তি ও

স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল আর্তি। বেকন (Bacon) ও হবস (Hobbes) থেকে শুরু করে জড়বাদী দর্শনচিন্তা ইংলন্ডে লক, বার্কলি (Barkeley) ও হিউম (Hume) পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিলো। লক প্রমুখ এই দার্শনিকরা মানবমনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ প্রতিচ্ছবিসমূহের শান্ত সংগ্রাহক (a passive recorder of sense impressions) হিসেবে দেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে বার্কলি এমপিরিসিস্ট দর্শনকে এমন এক স্বতন্ত্র খাতে বইয়ে দিলেন যে, জড়জগতের অস্তিত্বই তাতে অস্বীকৃত হলো। অপরপক্ষে হিউম কেবলমাত্র খণ্ড বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিচ্ছবির মধ্যেই অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ রাখলেন যাতে করে সুসংহত ও সামগ্রিক জ্ঞানলাভ অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হলো। এই জড়বাদ-সন্দেহবাদ (Septicism)-শাসিত দর্শনচিন্তার যান্ত্রিকতায় আলোড়ন সৃষ্টি করলেন জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Kant)। তার Critique of Pure Reason (1781) গ্রন্থে কান্ট 'যুক্তি' তথা Reason-এর শক্তি ও সম্ভাবনাসমূহের কথা বললেন; ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথা বললেন। কান্টীয় দর্শনচিন্তা কালক্রমে জার্মান রোমান্টিকতার দিক নির্দেশক হয়ে উঠলো। তরুণ কবির প্রবাদ প্রতিম সৃজনী-বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত লিরিক্যাল ব্যালাডস থেকে শুরু করে ঔপন্যাসিক স্কটের মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালকে ইংরেজি সাহিত্যের আলোচনায় 'রোমান্টিক রিভাইভাল' বা রোমান্টিকতার পুনর্জন্মের কাল বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই রিভাইভাল বা পুনর্জন্ম কথাটি বুঝতে গেলে এলিজাবেথীয় যুগের রোমান্টিকতার সঙ্গে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ প্রমুখের রোমান্টিকতার তফাতগুলি বুঝে নেওয়া দরকার। এলিজাবেথীয় রোমান্টিকতার পশ্চাৎপটটি ছিলো নবজাগরণের ; অজানাকে জানার অদম্য আগ্রহ, অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কারের সাহস ও বিস্ময়, উদ্দীপক জাতীয়তাবোধ, মনীষার বিপুল ঐশ্বর্য ইত্যাদি। অন্যদিকে 'রোমান্টিক রিভাইভাল'-এর প্রেক্ষিতটি ছিলো ফরাসি বিপ্লবের। সামাজিক-রাজনৈতিক বিদ্রোহ সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার শপথ, মানুষের মর্যাদা ও মানবতার মূল্য ইত্যাদি ছিলো সাহিত্যে এই পুনরুজ্জীবনের চালিকাশক্তি। এলিজাবেথীয় রোমান্টিকতার স্বপ্নদৃষ্টিতে ছিলো না বিষাদ বেদনার তীব্রতা, গভীর আত্মমগ্নতা, অতীতচারিতা। এলিজাবেথীয় যুগের রোমান্টিকতা প্রকাশ পেয়েছিলো

নাটকের মতো বস্তুলীন মাধ্যমে ; অন্যদিকে লিরিক্যাল ব্যালাডস-এর যুগপর্বে কল্পনা, সৌন্দর্যসন্ধান, অতিপ্রাকৃত ইত্যাদির বাহন হয়েছিলো আত্মলীন লিরিক কাব্য-কবিতা।

৮.২ রোমান্টিক আন্দোলনে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী বহন করে এনে যে ফরাসি বিপ্লব সমগ্র বিশ্বের মানসপটে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলো রোমান্টিক যুগের ইংরেজি সাহিত্য সে মহা-বিস্ফোরণের কাছে নানাভাবে ঋণী। ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী ইংরেজ কবি সাহিত্যিকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলো। এই প্রসঙ্গে রুশোর ঋণের কথা সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম ভাবপুরোহিত রুশো ছিলেন বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বের প্রধান তত্ত্বকার, যার ভাব-ভাবনার প্রভাব লক্ষ করা যায় ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি প্রমুখের কাব্যে। বর্তমান অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে রুশোর প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

বিপ্লবী প্রণোদন সর্বাপেক্ষা আলোড়িত করেছিলো কবি শেলিকে। তার কল্পনা মথিত হয়েছিলো বিপ্লবের ঝোড়ো ভাবধারায়। এ ব্যাপারে শেলির দীক্ষাগুরু ছিলেন উইলিয়ম গডউইন (Godwin) যাঁর নৈরাজ্যবাদী দর্শনের সঙ্গে রুশোর প্রকৃতিবাদী চিন্তার বৌদ্ধিক সম্পর্ক ছিলো। এই গডউইনের Enquiry Concerning Political Justice (1793) সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবনত শেলি বলেছিলেন, এই গ্রন্থটি তাকে শিখিয়েছিলো ‘all that was valuable in knowledge and virtue’। সংগঠিত ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শেলির রচনায় যে বিদ্রোহের নির্ঘোষ শোনা গিয়েছিলো তার পেছনেও ছিলো গডউইনের নৈরাজ্যবাদী দর্শনচিন্তা। The Necessity of Atheism (1811) নামক পুস্তিকাটির নাম এ-প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। শেলির ওপর গডউইনের প্রভাব ও উভয়ের যোগাযোগের অপর এক বিশিষ্ট উদাহরণ Queen Mab (1813), যেটিকে গডউইন-চিন্তার কাব্যরূপ বলে মনে করা হয়ে থাকে। আসলে তার গুরু গডউইনের মতো শেলিও প্রধানত আলোড়িত হয়েছিলেন বিপ্লবী চিন্তাদর্শে তথা বিমূর্ত ভাবধারায়। ফরাসি বিপ্লবের প্রকৃত ঘটনাবলী, তাদের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক তাৎপর্য, দুর্যোগ-

দুর্বিপাক ইত্যাদি অনুধাবন করার মতো মানসিক গঠনই ছিলো না শেলির। | ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্ব ছিলো ভাবগত প্রস্তুতির পর্ব, আর এই পর্বের ঋত্বিক ছিলেন রুশো। গডউইনের দর্শনের উৎসে ছিলো এই বিপ্লবী তত্ত্ব। ব্লেকের কবিতায় এই তত্ত্বই লাভ করেছিলো এক আনন্দঘন অধ্যাত্মবীক্ষার রূপ। স্বাধীনতা ব্লেকের কাছে ছিলো এক রাহসিক উল্লাস। শেলির কাব্যে প্রেমের যে শক্তি ও মূল্যের কথা বার বার বলা হয়েছে তার বীজ ছিলো রুশোর রচনা, Net Heloise-এ। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের রাজনৈতিক পর্বের সূত্রপাত হলে তার উত্তাপ অবিলম্বে পৌঁছে গেলো কোলরিজ, সাদে (Southey) প্রমুখ কবিদের মানসলোকে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফ্রান্সে যান এবং বিপ্লবের সেই উত্তাল পর্বে এক বৎসর কাল ফ্রান্সে কাটান। এই সময়ে লেখা,Descriptive Sketches-এ তাঁর বৈপ্লবিক ভাবনা বিধৃত হয়েছে। এছাড়া গডউইন-এর Political Justice-এর প্রেরণায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন Guilt and Sorrow (1791-94) এবং The Borderers (1795-96); ফরাসি বিপ্লবের উদ্দীপনা এইভাবে ধরা পড়েছিলো তার কবিতায় :

Bliss was it in that dawn to be alive,

But to be young was very heaven!

অবশ্য ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই উদ্দীপনা তার কবিজীবনের উত্তর-পর্বে নির্বাপিত হয়েছিল এবং তিনি রূক্ষণশীলতার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম ভাব-ব্যক্তিত্ব রুশোর প্রতিবাদ ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো তাতে সন্দেহ নেই। প্রকৃতি-লালিত এক আদিম জীবনাদর্শের জয়গান করেছিলেন রুশো যা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মানুষ ও প্রকৃতি-বিষয়ক ভাবনাকে উজ্জীবিত করেছিলো তার কাব্য-কবিতায়।ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে প্রকৃতির সহজ ও স্বতঃস্ফুর্ত জীবনে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, আধুনিক নগরজীবনের কৃত্রিমতা থেকে মুক্তির আবশ্যকতা বিষয়ে আবেগার্ত ভাষ্য রচনা করেছিলেন, তা ছিলো রুশোর দর্শনিভাবনায় প্রাণিত। রোমান্টিক যুগের অপর এক কবি বায়রন (Byron)-এর কাব্যে আবেগ ও উন্মাদনার যে ঝড় বয়ে যেতে দেখা গিয়েছিলো তা ছিলো ফরাসি বিপ্লবের শেষ পর্যায়

অর্থাৎ নেপোলিয়নের সামরিক অভিযানের প্রভাবজাত। উদ্ধত ও ঘোর আত্মকেন্দ্রিক কবি বায়রন নেপোলিয়ন চরিত্রে ভয়ংকর গতিশক্তির মধ্যেই উত্তেজনার খোরাক পেয়েছিলেন। বিপ্লবের তাত্ত্বিক অথবা ঐতিহাসিক দিকগুলির প্রতি তিনি কোন আকর্ষণ বোধ করেননি। তবে এক অদম্য স্বাধীলতার স্পৃহা অবিরত তাড়িত করেছিলো বায়রনকে। তার সৃষ্ট চরিত্র ডন জুয়ান ছিলো বুর্জোয়া। নীতিবোধের প্রথাগত্যের বিরুদ্ধে এক দুর্দমনীয় প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব। রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব কিটসের কাব্য-কবিতায় কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের তেমন কোনো লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যায় না। বিপ্লবী আদর্শ, নিষ্ঠুরতা, রক্তপাত ও কোলাহল সৌন্দর্যতাপস কবি কিটসের ভাবনায় বিশেষ ছাপ ফেলতে পারে নি। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রান্তির শ্লোগান সেভাবে কিটসকে আলোড়িত করে নি, যেভাবে তাকে আকর্ষণ করেছিলো সুন্দর ও সত্যের চিরন্তন আদর্শ। ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব ইংরেজি সাহিত্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য হলেও তা মোটের ওপর সংহত ও সুসমঞ্জস ছিলো না। স্কট (Scott)-এর মতো সফল ঔপন্যাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার পরিচয় দিলেও নিজে ছিলেন একজন অনমনীয় টোরি (Tory), রক্ষণশীলতার সমর্থক। বায়রন-এর কাব্যে বিপ্লবের তড়িৎ-প্রভাব থাকলেও তিনি অষ্টাদশ শতকীয় কবিতার একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের রূপান্তরের কথা তো আগেই বলা।

৮.৩ লিরিক্যাল ব্যালাডস : রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের সূচনা

১৭৯৮-এ ব্রিস্টলে প্রকাশিত হয়েছিলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের কবিতার এক মিলিত সংকলন- *লিরিক্যাল* ব্যালাডস-যাতে কোলরিজের চারটি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের উনিশটি রচনা মুদ্রিত হয়েছিলো। এই কবিতাগুলি ও তার শুরুতে ওয়ার্ডসওয়ার্থ রচিত

একটি বিজ্ঞপ্তি (Advertisement) সংকলনটিকে কবিতার বিষয়-আঙ্গিক-রুচির ক্ষেত্রে এক নতুন দিক-নির্দেশ বলে চিহ্নিত করেছিলো। অষ্টাদশ শতকের কাব্যভাষা ও প্রকরণের বিরুদ্ধে নবীন কবিদের এ ছিলো এক সচেতন আত্মঘোষণা। সমারসেটে বন্ধু ও প্রতিবেশীরূপে বসবাসের বছরগুলিতে (১৭৯৫-৯৮) ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ তাদের ভাব-বিনিময় ও কাব্যচর্চার মধ্যে দিয়েই রচনা করেছিলেন *লিরিক্যাল ব্যালা*ডস্-এর ক্ষেত্রভূমি। অষ্টাদশ শতকের জড়বাদী দর্শন ও নিও ক্ল্যাসিক্যাল কাব্য-প্রকরণের বিরুদ্ধে আবেগ ও কল্পনার স্বতঃস্ফুর্ত উৎসারের রোমান্টিক প্রকল্পটি এই দুই কবির প্রীতিপূর্ণ সহমর্মিতায় জারিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলো লিরিক্যাল ব্যালাডস এ যা অদ্যাবধি ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের মাইলফলক রূপে স্বীকৃত। কোলরিজের বিখ্যাত অতিলৌকক রূপক-কবিতা—'The Rime of the Ancient Mariner' এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'The Thorn', 'Tintern Abbey' প্রভৃতি প্রথম সংস্করণের তেইশটি কবিতার মধ্যে চারটি ছিলো কালরিজের বাকি উনিশটি ওয়ার্ডসওয়ার্থের। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ন রচনা সংকলিত হয়েছিলো লিরিক্যাল ব্যালাডস-এ। এ-কাব্যগ্রন্থের রচনাগুলি ছিলো। পরীক্ষমূলক ও 'Advertisement'-এর ভাষ্য অনুযায়ী এগুলির উদ্দেশ্য ছিলো '...to ascertain how far the languae of conversation in the middle and lower class of society is adapted to the purpose of poetic pleasure.' ১৮০০-র দ্বিতীয় সংস্করণে "Advertisement"-এর জায়গায় এলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রণীত "Preface" এবং সংকলিত রচনাগুলি ও তাদের ক্রমবিন্যাস পরিবর্তিত হলো। দ্বিতীয় সংস্করণে এলো কোলরিজের আর একটি কবিতা 'লাভ'; কিন্তু গ্রন্থের নামপত্র থেকে বাদ গেলো কোলরিজের নাম। এই 'সংস্করণ' ওয়ার্ডসওয়ার্থ অন্তর্ভুক্ত করলেন তার বেশ কয়েকটি নতুন রচনা, যেমন—তার লুসি-বিষয়ক কবিতাগুলি, "দ্য ওল্ড কামবারল্যান্ড বেগার' এবং 'মাইকেল'। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের সংণে এই যুগান্তকারী সংকলনটি আবারও সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ লাভ করে।

ক) প্রিফেস টু দি লিরিক্যাল ব্যালাডস: রোমান্টিক কাব্যাদর্শের ইস্তাহার :

লিরিক্যাল ব্যালাডস-এর দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ (Perface) লিখেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটিকে সাধারণভাবে রোমান্টিকদের প্রস্তাবিত কাব্যাদর্শের ইস্তাহার বলে মনে করা হয়ে থাকে। এখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভালো কবিতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে , 'all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings.' অনুভূতির স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ সমস্ত ভাল কবিতার সারাৎসার। আর এর বীজ হলো 'emotional recollected in tranquility.' প্রশান্তি এই কবিতার মূল সুর, গভীর অনুধ্যান এর সৃজনক্ষেত্র, স্বতঃস্ফূর্ততা এর কুললক্ষণ। রোমান্টিক কাব্যাদর্শ তাই অষ্টাদশ শতকীয় প্রথা-প্রকরণের বিরোধী এক 'অবোধপূর্ব শিল্প'; শেলির স্কাইলার্কের স্বর্গীয় সঙ্গীতের অনুরূপ এক 'unpremeditated art' | ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিচারে কবি একজন অতি সংবেদনশীল মানুষ, 'Possessed of more than usual organic sensibility', এমন একজন মানুষ যিনি দীর্ঘ ও গভীর চিন্তাক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু মূলত একজন মানুষ যনি অন্য মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন—'a man speaking to men.' কবি ও কবিতাসম্পর্কিত এইসব অভিমত ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় তথা রোমান্টিক কাব্য ভাবনার স্বরূপটিকে চিহ্নিত করেছিলো। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাধারণ পল্লী-জীবন তথা নিসর্গের সহজ ঘটনাগুলির কথা বলেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে ঐ ধরনের পরিস্থিতিতেই মনের আবেগগুলি যথাযথ পরিচর্যা পাবে। আর এইসব সাধারণ ঘটনাগুলিকে তিনি চেয়েছিলেন কল্পনার বর্ণালীতে রঞ্জিত করে তুলতে যাতে তারা অসাধারণত্ব অর্জন করে।

আলোচ্য মুখবন্ধে কবিতার ভাষা তথা কাব্যশৈলী বিষয়েও গুরুত্বপুর্ণ মতামত জ্ঞাপন করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। কৃত্রিম ও চটকদার শব্দচয়ন পরিত্যাগ করে কাব্যরচনায় তিনি মানুষের প্রকৃত কথ্য ভাষায়ীতকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন—'a selection of the real language of men in a state of vivid sensation.' তিনি মনে করেছিলেন গদ্য ভাষা এবং কাব্যভাষার মধ্যে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য নেই।

কাব্যতত্ত্বের এই প্রস্তাবনার প্রতি কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে কতখানি দায়বদ্ধ থাকতে পেরেছিলেন তা নিয়ে সংশয় আছে। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তিনি তার ঘোষিত সুত্রগুলির প্রতি মোটের ওপর অনুগত ছিলেন। গ্রামজীবন ও পল্লীনিসর্গ এবং তার শান্ত সৌন্দর্য ছিলো তার রচনাবলীর মুখ্য বিষয়। তবে ভাষা ও শৈলীর ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যে দ্বৈততা খুব স্পষ্ট। তার কবিতায় আবেশ-উদ্দীপক যখন লক্ষণীয় ভাবে কম থেকেছে এবং তিনি তার তত্ত্বের কথা মনে রেখে ব্যাবহারিক গদ্যের ভাষায় লিখতে গেছেন তখনই 'Simon Lee'-র মতো কবিতা পেয়েছি আমরা। অন্যপক্ষে, গদ্যের জীর্ণতা থেকে মুক্ত, সহজ-সরল-লুসি-বিষয়ক কবিতাগুলি (Lucy Poems) আবেগের সজীবতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। গদ্য ও পদ্যের ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য, নেই, এই অভিমতের প্রতিও ওয়ার্ডসওয়ার্থ কার্যত আনুগত্য প্রকাশ করেন নি। এটি ছিলো পোপ (Pope) ও তার অনুসারী কবিদের ভাষার কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আসলে, নিও-ক্লাসিক রীতি ও প্রকরণের বিরুদ্ধে নব-প্রজন্মের এই রোমান্টিক কবিদের যে অনাস্থা তারই একটি বিদ্রোহাত্মক কর্মসূচী ছিলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখিত 'Preface to The Lyrical Ballads'।

খ) 'কল্পনা' (Imagination) ও কাল্পনিকতা' (Fancy) কোলরিজের তত্ত্ব:

রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বে 'কল্পনা'-র নিরঙ্কুশ অবস্থান ও গুরুত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। রোমান্টিকদের কাছে 'কল্পনা' ছিল এক ঐশী শক্তি, ব্যক্তিমানসের এক বিস্ময়কর সৃজনক্ষমতা, অধ্যাত্মবীক্ষার উৎসস্বরূপ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'The Prelude' কবিতায় এই শক্তিকে দেখেছিলেন। এইভাবে:

An auxiliar light

Came from my mind, which on the setting sun

Bestowed new splendour.

অষ্টাদশ শতকে মানবমনকে দেখা হয়েছিলো নিষ্ক্রিয় এক টুকরো কাগজ *(tabula rasa)* হিসেবে। লকীয় দর্শন ও নিউটনীয় বিজ্ঞানের এই যুগে কবিতা ছিলো নিছক

বৌদ্ধিক সরসতা (wit)-র অনুশীলন, ড্রাইডেন-পোপ-জনসনের কাছে 'কল্পনা' নামক কোনো বস্তুর তাৎপর্য ছিলো । নিও-ক্ল্যাসিক নন্দনতত্ত্বে 'কল্পনা'-কে দেখা হয়েছিলো বিভ্রম সৃষ্টিকারী শক্তিরূপে যা যুক্তি (Reason)-র বিরোধী। টমাস হব, 'কল্পনা'-কে বলেছিলেন 'decaying sense' আর ডঃ জনসনের অভিধানে 'কল্পনা' সংজ্ঞায়িত হয়েছিলো 'কাল্পনিকতা' রূপে—'Fancy; the power of forming ideal pictures.'

কোলরিজ তার *Biographia Literaria* (1817) গ্রন্থে 'কল্পনা'-র একটি নতুন ধারণা উপস্থাপিত করেন ও কাল্পনিকতা' (Fancy)-র সঙ্গে তার প্রভেদ নির্দেশ করেন। কোলরিজের মতে "Fancy' এক যান্ত্রিক শক্তি বা প্রক্রিয়া যার কাজ ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রতিমাগুলি (images)-কে একত্রিত করা অর্থাৎ এতে নব সৃজনের কোনো শক্তি নেই। অন্যপক্ষে "Imagination' এক সৃষ্টিশীল শক্তি, যা dissolves, diffuses, dissipates, in oder to re-create', কোলরিজ একে আখ্যা দিলেন এক 'esemplastic power'-রূপে। এই সঞ্জীবনী শক্তির কাজ পরস্পর বিরোধী উপাদানসমূহের সার্থক সমন্বয়, 'the balance or reconciliation of opposite or discordant qualities'। এই 'বৈপরীত্যের মিলন' তথা 'Union of opposities' শ্লেগেলের হাতে পরিণত হয়েছিলো জার্মান রোমান্টিকতার মূলসূত্রে। কোলরিজ এই জার্মান ভাব উপাদানগুলিকে আত্মস্থ করেছিলেন। 'কল্পনা'-র দুটি রূপের কথাও বলেছেন কোলরিজ 'Primary' ও 'Secondary' | প্রথমটি এক অসচেতন ক্রিয়া যার দ্বারা মন বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান লাভ করে। অন্যপক্ষে, 'Secondary imagination' এক সচেতন শক্তি যা ব্যক্তিমানস ও আত্মার সকল ক্রিয়াকে সমন্বিত করে নব-সৃজনের লক্ষ্যে। সূত্রাকারে বলতে গেলে কোলরিজের 'কল্পনা' হলো, 'বোধ' (Perception), 'স্মৃতি'(Memory), অনুষঙ্গ (Association), 'অনুভূতি'(Feeling) 'বুদ্ধি' (Intellect)-র সংশ্লেষ। কোলরিজের এই তত্ত্বের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলো ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা, যাতে গভীর অনুভব ও প্রগাঢ় মননশীলতার সমন্বয় লক্ষ করেছিলেন সুহৃদ কোলরিজ।

৮.৪ রোমান্টিকতার লক্ষণসমূহ

রোমান্টিকতার একটি সাধারণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যেমন কঠিন, তেমনই উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক বলে যে-সব কবি-লেখক চিহ্নিত হয়ে ও কেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর যাবতীয় বিভিন্নতা নিরসন করে একটি সরলীকত সুত্র-নিদের্শ ও অসম্ভব। তবে আলোচনার সুবিধার্থে রোমান্টিক কবিমানসের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. প্রকৃতিপ্রেম -

নিসর্গ প্রকৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ ও নিবিড় অনুরাগ ছিলো রোমান্টিকতার উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিকতার পুনর্জাগরণকে তো বলাই হয়েছিল ‘Return to Nature’। এই শব্দটির উৎসে ছিলেন ফরাসি লেখক ও দার্শনিক রুশো। আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে, কৃত্রিমতা থেকে আদিম মানবজীবনের প্রতি নির্ভর সহজ সারল্যে ফিরে যাওয়ার আহ্বান ছিলো এই শব্দবন্ধে। ওয়ার্ডর্সওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি ও কিটস তাদের। কবিজীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত করেছিলেন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের নিবিড় সান্নিধ্যে। এদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের খ্যাতি তো প্রকৃতি তথা প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ক অধ্যাত্মদর্শনের কবিরূপেই। কেবলমাত্র পল্লী-নিসর্গ তথা ভূ-দেশের মনোরম বর্ণনাতেই রোমান্টিক কবিদের। প্রকৃতিপ্রেম সীমাবদ্ধ ছিলো এমন নয়। রোমান্টিক নিসগপ্রকৃতি ছিলো সজীব ও লীলাচপল, চৈতন্যময় ও প্রাণদ এক সত্তা যার সঙ্গে একাত্ম হবার আকুতি ও আনন্দই ছিলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখের কাব্যের বিষয়। বস্তুতপক্ষে, এই ‘প্রকৃতি’ (Nature) এবং রোমান্টিক কবি-কল্পনা (Imagination)-র ছিলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই সম্পর্কের চমৎকার বিবরণ দিয়েছিলেন কোলরিজ তাঁর "Dejection : An Ode’ কবিতায় ‘...we receive but what we give. /And in our life alone does nature live...'

অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদি প্রকরণ-শৃঙ্খলা-শাসিত কাব্য-কবিতা ছিলো মূলত নগরজীবন কেন্দ্রিক। কফি-হাউস, ক্লাব, উচ্চবিত্তদের বৈঠকি আড়া ইত্যাদির কত্রিম ও সুসজ্জিত পরিবেশকে। কেন্দ্র করেই রচিত হতাে রঙ্গ-বঙ্গ-ধর্মী কাব্য-কবিতা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটস, কোলরিজ প্রমুখ কবিরা এই সীমায়িত পরিসর থেকে কবিতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন পাহাড়-নদী-উপত্যকা বনানী-আকাশ নক্ষত্রের এক বিস্তৃত, উদার পরিসরে। একইসঙ্গে আধুনিক নাগরিক জীবনের কেতাদুরস্ত নিয়মশৃঙ্খলার খাঁচা থেকে মন-পাখিটিকে উন্মুক্ত নিসর্গের বন্ধনহীনতায় উড়িয়ে দিতে রোমান্টিক কবিরা ফিরে গেলেন শৈশবের উজ্জ্বল স্মৃতির সরণীতে, মধ্যযুগের বর্ণময় অতীত ইতিহাসে, গ্রামীণ মানুষদের সহজ সাবলীল জীবনযাপনের ইতিবৃত্তে। প্রকৃতিজগৎ তথা পল্লীনিসর্গের বহিরঙ্গের নানা বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে কবিতায় এসেছিলো অলঙ্কার রূপে অথবা কবিতায় মানবজীবনের পটভূমি হয়ে। রোমান্টিক কবিদের রচনায় কিন্তু প্রকৃতি দেখা দিলো এক প্রাণময়, চৈতন্যময়, সজীব সত্তা রূপে, জড়বস্তুর বিবরণ রূপে নয়। সম্পদ ও ঐশ্বর্যে অফুরান প্রকৃতি হয়ে উঠলো মানুষের আশ্রয়, সানা, সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক। রাোমান্টিক কবির মরমি কল্পনায় প্রকৃতি-বিশ ও মানব-বিশ্ব একীভূত হয়ে রূপ নিলো এক অখণ্ড সত্তায়। কখনো বা সেই প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যে সংকেতিত হলো এক অতিপ্রাকৃত রহস্যোপলব্ধি। বাস্তবতায় দুঃখ-বেদনা থেকে রোমান্টিক কবি-মানস ডুব দিতে চাইলে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সংবেদনশীল ও ইন্দ্রিয়ময় বিস্তারে এবং কখনো বা রূপের সীমা ছাড়িয়ে অরূপের অন্তর্লকে।

২. মানবপ্রেম -

প্রকৃতি তথা নিসর্গপ্রেমেই সংশ্লিষ্ট প্রত্যয় হিসেবে মানবপ্রেম স্বীকৃতি লাভ করেছিলো, রোমান্টিক কাব্যে। প্রকৃতির কাছে ফেরার আকুলতার পেছনে যেমন ছিলো রুশোর ভাবধারা, তেমনই সাধারণ মানুষের সহজ ও তুচ্ছ জীবনকাহিনীকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ কবিরা তাদের কাব্যের বিষয়ভুক্ত করেছিলেন রুশোর প্রভাবে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো প্রকৃতি-বিশ্ব ও মানব-বিশ্বকে এক সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে এমন অধ্যাত্ম-বন্ধনের কথাও বলেছিলেন। অন্যপক্ষে শেলি ছিলেন পরিপূর্ণ মানব-প্রেমিক যিনি প্রকৃতির মাঝে

সন্ধান করেছিলেন অপ্রাকৃত ঐশী শক্তির যা স্খলিত ও হতাশাগ্রস্ত মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে। ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শের গভীরে ছিলো মানবপ্রীতি। সাধারণ অখ্যাত মানুষদের কথা সেই সূত্রেই স্থান পেলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটসের কবিতায়। রোমান্টিকদের কাছে প্রকৃতিপ্রেম ও মানবপ্রেম বিচ্ছিন্ন বিষয় বলে মনে হয় নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি-বিষয়ক কবিতাগুলিতে 'মাইকেল', 'রেজোলিউশন অ্যান্ড ইনডিপেন্ডেন্স', 'দ্য ইডিয়ট বয়' প্রভৃতি রচনায় সহজ সরল গ্রামীণ নারী-পুরুষ, বালক-বালিকাদের জীবনের বেদনা ও হাহাকার প্রকাশিত হয়েছে। প্রমিথিউস আনবাউন্ড , দ্য রিভোল্ট অব ইসলাম ও কুইন ম্যাব-এ উচ্চারণ করেছিলেন পীড়িত মানবজাতির যন্ত্রণা ও আর্তি এবং তা থেকে উত্তরণের প্রত্যয়। কিটসের ওডগুলিতে বর্নিত হয়েছিল সময়ের ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর অনিবার্যতা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ।

৩. বিদ্রোহের সুর -

সামাজিক-রাজনৈতিক অনুশাসন, জড়বিশ্বাস, প্রচলিত সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর রোমান্টিকদের এক গোত্রভুক্ত করেছিলো। ফরাসি বিপ্লব ছিলো এই বিদ্রোহের ঝড়ের চোখ। কবি ও চিত্রকর ব্লেক জড়জগতের সীমাবদ্ধতা ও ইন্দ্রিয়সমূহের স্বেচ্ছাচারী একাধিপত্য (despotism of the senses) অতিক্রম করে আর এক অতিলৌকিক কল্পনার জগতে উত্তরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ইউরোপের অতিপ্রাকৃত ভাবধারার শরিক ব্লেক শিল্পনির্ভর সভ্যতার অমানবিক নিয়ন্ত্রণ চূর্ণ করে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন ইন্দ্রিয়াতীত শুদ্ধতার এক প্রতীকী জগতে। তবে শেলির কবিতায় এই বিদ্রোহ যতখানি মূর্ত অথবা বায়রনের কালে তার উন্মাদনা যতটা প্রকট তেমনটা অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। বিশেষত ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই ঝোড়ো উত্তেজনার পরিবর্তে দেখি এক গভীর দার্শনিক সুমিতি। শেলির 'রিভোল্ট অব ইসলাম'-এ অত্যাচারী শাসকদের দমন-পীড়নের হাত থেকে মানবমুক্তির বিষয়টি কবির বিপ্লবী ভাবাদর্শেরই পরিচায়ক। তার অনবদ্য কাব্য-নাটক প্রমিথিউস *আনবা*উন্ড-এও শেলি অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে পীড়িত মানবতার বিদ্রোহ ও জয়ের কাহিনি রচনা করেছিলেন। প্রমিথিউস নামক ঋহিকের চরিত্র অবলম্বনে। তার বিখ্যাত 'ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড'-

এর শেষে শেলি উচ্চারণ করেছিলেন অনমনীয় বিপ্লবী আশাবাদের মর্মবাণী। সকলপ্রকার উৎপীড়ন ও নিয়মের অনুশাসনের বিরুদ্ধে কবি বায়রন ছিলেন সর্বদাই সোচ্চার। স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহায় ও প্রতিবাদের দুরন্ত মুদ্রায় বায়রন শেলির ঘনিষ্ঠতম সতীর্থ। 'ডন জুয়ান'-এ বায়রনের এই বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের সুরটি চড়া পর্দায় বাঁধা –'For I will reach, if possible, the stones/To rise against earth's tyrants'. রোমান্টিক পুনরুজ্জীবন ছিলো প্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব ফরাসি বিপ্লবের কড়া হাওয়ার উদ্দীপনায় তাড়িত। উচ্চবর্গীয় তথা অভিজাতদের বিলাস-বিনোদন তথা ধ্রুপদি/নব্য-ধ্রুপদি সাহিত্যাদর্শের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই কবিতা চলে এসেছিলো রাখাল বালক, শস্য কর্তনকারী বালিকা, গ্রামীণ নর-নারী, পরিচারিকা সহ সাধারণ মানুষের জীবনের খুব কাছাকাছি। ভাষা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও অষ্টাদশ শতকের বিধিনিয়ম ভেঙে কবিতা পৌঁছে গিয়েছিলো সাধারণ মানুষের কাছে বাগধারা অবলম্বনে ও তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য রূপরীতির মাধ্যমে।

৪. আত্মমগ্নতা -

রোমান্টিক সাহিত্যের একটি সর্বজনবিদিত বৈশিষ্ট্য কবিমানসের আত্মমগ্নতা ও এক আত্মগত প্রকাশভঙ্গী। রোমান্টিক মনোভঙ্গীর মূলে ছিলো এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিকোণ । রোমান্টিক কবিকে দেওয়া হয়েছিলো "egotistical sublime', এই অভিধা। আধুনিক কবি সম্প্রদায়ের পুরোধা টি. এস. এলিয়ট তার 'নৈর্ব্যক্তিকতা' (Impersornality)-র তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন রোমান্টিকদের আত্মজৈবনিক ও আত্মমগ্ন শিল্পের কড়া সমালোচনায়। রোমান্টিক কবি মুলত ভাববাদী, আবেগপ্রবণ ও নিঃসঙ্গতাপ্রিয়। ভূ-দৃশ্যের অপার রূপবৈচিত্রের ঘনিষ্ঠ তারা নগরজীবনের একঘেয়েমি ও ক্লান্তি ভুলে থাকায় আগ্রহী ছিলেন। বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়পূর্ণতা থেকে তারা চলে যেতে চাইতেন কল্পনার রহস্য-রোমাঞ্চে, আবেগ অনুভবের অন্তর্লীন দূরগামিতায়, সময়ের বিনাশী আধিপত্য অতিক্রম করে অনান্য ভাবলোকের ইন্দ্রিয়াতীত গূঢ়তায়। নির্জনতা, নৈঃশব্দ্য, দূরবিস্তরী কল্পনার অংশলোকে মগ্ন হয়ে তারা সন্ধান করতেন এমন এক আলোর যা অলীক ও অনশ্বর। যুক্তি-তর্ক, শাসন-সংস্কারের পরোয়া না করে রোমান্টিক

কবিরা নিমগ্ন থেকেছেন তাদের অনুভব, সংবেদনা ও উপলব্ধির নিজ নিজ জগতে। ব্লেক, শেলি ও কিটস রোমান্টিক আত্মমগ্নতার তিন অনন্য শিল্পী।

৫. সৌন্দর্যপ্রেম ও সুন্দরের উপাসনা -

মরণশীল জীবন ও যন্ত্রণাদীর্ণ জড়জগতের সীমা ছাড়িয়ে এক শাশ্বত ও সুন্দর অলোকসামান্য জগতের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন রোমান্টিক কবিরা। সুন্দরের প্রতি এদের ছিলো প্রবল প্রেম; সুন্দরই ছিলো পরমারাধ্যা। সুন্দরই প্রতিভাত হয়েছিলো সত্য রূপে, নিরন্তর আনন্দের উৎসরূপে। সুন্দরের উপাসনার তীব্র আকুতি পরিলক্ষিত হয় কীটসের কবিতায়। তার নিজের কথাতেই—'I have loved the principle of Beauty in all things' : নারী, প্রকৃতি ও শিল্প—সর্বত্রই কিটসের উপাস্য সুন্দর—'A thing of beauty is a joy for ever.'

তবে সুন্দর তো কেবলই শান্ত ও মনোরম হবে এমন নয়। ব্লেকের কবি-কল্পনায় যে ভয়ঙ্কর আগুনে-বাঘের f'earful symmetry' ধরা পড়েছিলো তাকে তো প্রথাগতভাবে সুন্দর বলা যাবে না। কোলরিজের স্বপ্নময়তায় যে ভৌতিক জাহাজ আর মেরু সমুদ্রের হিমায়িত বর্ণচ্ছটার ছবি ভেসে উঠেছিলো তাও কি নিছক সুন্দর ? ওয়ার্ডসওয়ার্থ নদী-পাহাড়-অরণ্যের উপরিতলের গভীরে দেখেছিলেন এক অন্তজীবন, শুনেছিলেন মানবাত্মার নিঃশব্দ বেদনাগীতি। অর্থাৎ রোমান্টিকদের সৌন্দর্যবোধ ছিলো জটিল, হয়তো দ্ব্যর্থকও। নারী, শিশু, শিল্পকলা ও প্রকৃতি, যেখানেই সুন্দরের সন্ধান রোমান্টিক কবিরা করে থাকুন, সর্বদাই যেন তাতে মিশে গেছে বৈপরীত্য বা বিপ্রতীপতার মাত্রা। সুন্দর বস্তু বা কল্পদৃশ্য বা অনুভূতি, যাই হোক না কেন কিছু রহস্য/সংশয়/দূরত্ব তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই।

৬. অতীতচারিতা -

তাঁদের সমকালীন সমাজজীবনের প্রতি যার পর নাই বীতরাগে রোমান্টিক কবি-লেখকরা ডুব দিয়েছিলেন দূর অতীতে। স্কট ও কিটস্ অবগাহন করেছিলেন মধ্যযুগীয় পরিবেশ ও তার ঐশ্বর্য কল্পনায়। কোলরিজের কবিতাতেও এই medievalism-এর

ঝোক বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। এছাড়া প্রাচীন গ্রিসের দেব-দেবী, পুরাণ তথা গ্রিক পুরাবৃত্তের ভাবাকাশে স্বচ্ছন্দবিহারী ছিলেন কিটস। 'Hellenism'-এর তিনিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তৃষাতুর অভিসারী।

বর্তমান তথা সমকালীন বাস্তবতার জগতে তৃপ্ত না হয়ে রোমান্টিক কবি-লেখকেরা পুরাণ, ইতিহাস কিংবা কল্পনায় ভর করে চলে যেতে চান অতীতে—যা একদা ছিলো, কিন্তু এখন লুপ্ত হয়ে গেছে, অথবা কবি-কল্পনার বর্ণচ্ছটায় যা ভেসে ওঠে মানসপটে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'টিনটার্ন অ্যাবে', 'প্রেলিউড' আর 'ইয়ারো'র কবিতাগুলিতে সেই দীর্ঘ অতীতচারিতা। তাঁর কবিতায় তো কেবলই স্মৃতিবাহিত অতীত অভিজ্ঞতা। ক্রিয়ার কালও সেই 'অতীত'। 'দ্য অ্যানসিয়েন্ট ম্যারিনার', 'কুবলা খান' ও 'ক্রিস্টাবেল'-এর মতো কোলরিজের অতিপ্রাকৃত কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কবিতাগুলির প্রেক্ষাপট ও মধ্যযুগীয়। তাঁর 'দ্য ইভ অ*ব সেন্ট অ্যাগনেস*-এ কিটস মধ্যযুগের পটভূমিকায় প্রেমের রূপক-আখ্যান রচনা করেছিলেন। 'এণ্ডিমিয়ন', 'হাইপেরিয়ন', 'ওড অন আ গ্রেসিয়ান আর্ন', 'ওড টু সাইকি' প্রভৃতি কাব্য-কবিতায় অতীতচারী কিটস ফিরে গেছেন দূর অতীতে, গ্রিক পুরাবৃত্তের জগতে। শেলির প্রমেথিউস আনবাউন্ড নাটকে ও অ্যা*গেনাইস* শোকগাথায় সেই গ্রিক পুরাণেরই উপস্থিতি।

৭. আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদ -

রোমান্টিক কবিমানস বারবার ডানা মেলে দিয়েছে স্থান-কাল-পাত্রের উর্ধ্বে, পার্থিব । অভিজ্ঞতার জগতকে অতিক্রম করে এক সদাভাস্বর দিব্যলোকে। শেলির বিদেহী স্কাইলার্ক স্বর্গীয় জগতের অধিবাসী। ওয়ার্ডসওয়ার্থও এক অতীন্দ্রিয় বহসালীলার সন্ধানে, প্রকৃতি ও মানব-বিশ্বে। তথা সর্বব্যাপী এক আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। কিটস অথবা বায়রনও তাদের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর বিরোধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সময় প্রবাহে ধৃত মানবজীবনে ক্ষয়। ও মৃত্যুকে তারা অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন, প্রাণিত হয়েছিলেন স্বপ্নদর্শনের এক আদর্শ জগতে উত্তরণের স্পৃহায়।

যান্ত্রিকতা ও যুক্তিবতার বন্ধন ছিন্ন করে রোমান্টিক মানস সর্বদা যেতে চায় আধ্যাত্মিক অনুভূতি-উপলব্ধির কোনাে এক দূরললাকে। সে আধ্যাত্মিকতা কোনো ঐশী অস্তিত্বের দিকে অথবা কোনো তত্ত্ব/আদর্শের দিকে চালিত হতে পারে। যেমন ব্লেকের কবিতায় দিব্য কল্পনা, ইন্দ্রিয়সমূহের আধিপত্য লঙ্ঘন করে কোনো এক অতীন্দ্রিয় দীপ্যমানতার দিকে যাত্রা। ওয়ার্ডসওয়ার্থে যেমন এক বিশ্বপ্রকৃতির আদর্শলাকে। শেলির কবিতায় বৈপ্লবিক পুনরুজ্জীবনের প্রত্যয়দ্ধ উচ্চারণ। কোলরিজ যেমন জড়বাস্তবের সীমা পেরিয়ে চলে যান স্বপ্ন ও অতিপ্রাকৃতের এক মগ্নচৈতন্যে।

৮. বিষণ্ণতার সুর -

রোমান্টিক কবিমানস ক্রমাগত পীড়িত ও বিদীর্ণ হয়েছে আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে। কিট্‌স ও শেলির কাব্যে এই ‘antinomy' সুস্পষ্ট। মানবজীবনের দুঃখশে, মানবপ্রেমের অপূর্ণতা, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্ব, মরণশীলতা ইত্যাদি নিরন্তর পীড়া দিয়েছে অমৃতাভিলাষী স্বপ্নদর্শী কবিকে। এই দ্বন্দ্বই জন্ম দিয়েছে বিষন্নতার, অসর্তকতা ও নিঃসঙ্গতার বেদনার ও শেলির কবিতায় এর তীব্র প্রকাশ লক্ষ করা যায় : ‘I fall upon the thorns of life! I bleed,’ কিটসের কবিতায় এমন আকুল আর্তি নেই। বেদনাকে তিনি করেছেন সংযত।

তবু ‘ওড টু আ নাইটিঙ্গেল'-এর তৃতীয় স্তবক জুড়ে শোনা যায় মানুষের দুঃখময় জীবনের বেদনা ও বিষাদের স্মারক। অসাধারণ সেই সব পংক্তি—'Here, where men sit and hear each other groan : /where palsy shakes a few, sad, lash gray hairs. /where youth grows pale, and spectre-thin, and dies where but to think is to be full of sorrow/And leaden-eyed despairs.'—ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাতে কোথাও কোথাও বিষাদ-বেদনার বিক্ষিপ্ত সুর শোনা গেলেও তার রচনায় মূল সুরটি কিন্তু আনন্দের। কোলরিজের ‘দ্য পেইন্স অব স্লিপ” এবং “ডিজেকশন: অ্যান ওড' কবিতায় বিষন্নতার সুরটি অবশ্য স্পষ্ট।

৯. বিস্ময়বোধ -

এক, অপরিমেয় বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিলো রোমান্টিক কবিদৃষ্টিতে। “Renascence of Wonder" নামকরণ যে কারণে সার্থক। যা কিছু সহজ ও তুচ্ছ তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের বিস্ময়ে রোমান্টিক কবিমন হয়েছিল মোহাবিষ্ট। এই বিস্ময়বোধের জনক ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। সমুদ্র ও আকাশ, নদী ও পর্বতের পরিব্যাপ্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিস্ময়-নীলাঞ্জন প্রথম লেগেছিলো ওয়ার্ডসওয়ার্থের চোখে। শেলির বিদ্রোহবাণীতে কিটসের ইন্দ্রিয়পরতায়, কোলরিজের অতিপ্রাকৃত পরিবেশের রহস্যময়তায় ও বায়রনের অস্থিরচিত্ততার মধ্যেও এই বিস্ময়ের স্মরণ লক্ষণীয়। এলিজাবেথীয় যুগে নবজাগরণের প্রভাবে বিস্ময় জেগেছিলো ইংল্যান্ডের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান চর্চায়। অভূতপূর্ব মনীষার বিস্ময়। তারই আর এক রূপ, যেন আবেগ-উপলব্ধির ঐশ্বর্য ও সূক্ষ্মতায় তাকেও ছাপিয়ে গেলো এই রোমান্টিক যুগ। আকাশ, মাটি, নদী, পাহাড়, অরণ্য আর ফুল, পাখি, নারী, শিশু—এ সব সহজ, সাধারণ জীবন ও নিসর্গের মধ্যে রোমান্টিক কবিরা খুজে পেলেন সৌন্দর্য ও মানবতার অতুল ঐশ্বর্য।

১০. অতিপ্রাকৃতের রহস্য -

অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তুর বর্ণনায়, ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি অতিপ্রাকৃতের গভীরে এক মনস্তাত্ত্বিক গুঢ়তার সঞ্চারে কোলরিজ ছিলেন সর্বাধিক দক্ষ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের বিষয় ছিলো প্রকৃতি আর তার অন্তরঙ্গ সুহৃদ কোলরিজ বেছে নিয়েছিলেন অতিপ্রাকৃত, রহস্যঘন অভিজ্ঞতা। তার লক্ষ্য ছিলো ‘willing suspension of disbelief" অর্থাৎ পাঠকমনের অতি-লৌকিক রহস্যের পরিবেশটি এমন সুন্নতায় বিধৃত করতে চেয়েছিলেন কোলরিজ যে পাঠক স্বয়ং তার সংশয় ও অবিশ্বাসকে স্থগিত রাখতে বাধ্য হবে, লৌকিক অলৌকিকের ভেদরেখাটিই অবলুপ্ত হয়ে যাবে যেন। কোলরিজের অতিপ্রাকৃত বিষয় ও পরিবেশে কোনো স্থুলতার স্থান ছিলো না। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই তিনি আরোপ করতেন অপ্রাকৃত রোমাঞ্চ |

সহজ, বাস্তব জগতের উপাদানসমূহে লাগিয়ে দিতে অপার্থিব শিহরণ। Christabel. Ancient Mariner & Kubla Khan *কোলরিজের অতিপ্রাকৃত কাব্যের* বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। 'ক্রিস্টাবেল' কবিতার শুরু থেকেই এক আলো-আঁধারি, রহস্যকুহকে আবৃত পরিবেশ। স্যার লিওলাইনের মধ্যযুগীয় দুর্গপ্রাসাদে মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনি, পেঁচার তীক্ষ্ণ চীৎকার, হাল্কা ধূসর মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ ইত্যাদি এক গা-ছমছম করা নৈশ পরিবেশ গঠন করেছে।

এর মধ্যেই স্যার লিওলাইনের কন্যা শুচিসুন্দর ক্রিস্টাবেল অদূরবর্তী অরণ্যে বুড়ো ওক গাছের নীচে প্রার্থনা করতে গিয়ে দেখতে পায় ছলনাময়ী নারী জেরালডাইনকে, যার মিথ্যা কহিনির চাতুর্যে ভুলে ক্রিস্টাবেল তাকে আমন্ত্রণ করে আনে তাদের আশ্রয়ে , তার শয়নকক্ষে। জেরালডাইন রোমান্টিক-গথিক ধারার জাদুকরী, যে তার মোহজালে বিনষ্ট করতে চায় ক্রিস্টাবেলের শুচিতা ও সারল্য। এই রূপকধর্মী অতিপ্রাকৃত কবিতায় কোলরিজ আলো-অন্ধকার, শব্দ-নৈঃশব্দ্যের আভাসে-ইঙ্গিতে, ভাষা ও ছন্দের আশ্চর্য নৈপুণ্যে রচনা করেছেন এক রহস্যঘন, স্বপ্নাচ্ছন্ন বাতাবরণ।

সাতটি খণ্ডাংশে সম্পূর্ণ ব্যালাড 'দ্য রাইম অব দ্য এনশিয়েন্ট মারিনার' কোলরিজের বহু পঠিত অতিপ্রাকৃত রচনা। এখানেও যা কিছু ভৌতিক তথা ভীতিপ্রদ সব মনে হবে সহজ, স্বাভাবিক ও লৌকিক। একটি বিবাহসভায় জনৈক বৃদ্ধ নাবিক যে গল্প শোনালো তাতে কিন্তু অতিপ্রাকৃত রহস্যের বহু উপাদান আছে নাবিকের চোখের অদ্ভুত চাউনি; দূর মেরু-সমুদ্রের ভয়ঙ্কর নির্জনতা, নীরবতা ও বপুল হিমশৈলের শীতল শুভ্রতা ; নাবিক-কর্তৃক নিরপরাধ অ্যালবাট্রস নিধন ; আকস্মিক সমুদ্রে ভেসে আসা কঙ্কাল-পোত আর তার ওপর প্রেতিনীমূর্তি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। অথচ এইসব উপাদান সমুদ্র ও তার পরিবেশ এবং নাবিকের চরিত্রের মনোজগতের নানা সংকেতের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে, যে সেখানে কোনো স্থূল শিহরণ বা ভুতুড়ে রহস্যের খোঁজ করলে পাঠক হতাশ হবেন। কুবলা খান সাধারণভাবে একটি সম্পূর্ণ স্বপ্ন-কবিতা হিসেবে পরিচিত। কোলরিজের দাবি অনুযায়ী এই কবিতাটি তিনি এক অখণ্ড রূপে মানসপটে রচিত হতে দেখেছিলেন তাঁর স্বপ্নে। এখন আমরা তিপান্ন লাইনের যে

কবিতাটি পড়ি তাকে অবশ্য খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় না। এই কবিতাতেও মোঙ্গলবংশীয় সম্রাট কুবলার স্বর্গীয় উদ্যানে প্রাকৃতিক নিসর্গের সৌন্দর্য শোভায় কোলরিজ আরোপ করেছেন অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিতময়তাঃ

But oh! that deep romantic chasm which slanted

Down the green hill athwart a ceder cover!

A savage place! as holy and enchanted

As e'er beneath a waning moon was haunted

By woman wailing for her demon-lover!

কিটসও তাঁর ‘Lamia’,Isabella, La Bella Dame Sans Merci' প্রভৃতি কবিতায় অতিপ্রাকৃত রহস্য সৃষ্টিতে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

১১. ‘কল্পনা'র সার্বভৌমত্ব -

রোমান্টিক কাব্যসাহিত্যে ‘কল্পনা'র নিরঙ্কুশ গুরুত্বের কথা আগেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই সার্বভৌম শক্তির জোরেই জড়বিশ্বাস ও পার্থিব অস্তিত্বের সীমারেখা অতিক্রম করে কবিমানস মুক্তির সন্ধান করেছে অনন্ত ও অসীমের স্বর্গভূমিতে। এই ‘কল্পনা'-র দৌলতেই রোমান্টিক কবি মর্তসীমা চূর্ণ করে অর্জন করেছিলেন দেবত্বের গরিমা।

‘কল্পনা’এক সার্বভৌম সৃজনীশক্তি যা জন্ম দেয় কবিতার। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে যে কবিত্বশক্তিকে বলা হয়েছিল 'অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা', রঅমান্টিকদের কাছে তাই ছিলো কল্পনা।কিটসের ভাষায় ‘What the imagination seizes as beautiful must be true, Whether it existed before Or not.’ এই কল্পনা কবিকে নিয়ে গিয়েছিলো মধ্যযুগ ও তাকেও পেছনে ফেলে প্রাচীন গ্রিক/ রোমক ইতিহাস ও পুরাবৃত্তে। আবার এই ভুবনবিহারী কল্পনা কবিকে দেখিয়েছিলো আগামী পৃথিবীর স্বপ্ন, মানবমুক্তির আকাঙক্ষা।

১২. ভাষা ও শৈলীর নতুনত্ব -

ওয়ার্ডসওয়ার্থ কৃত লিরিক্যাল ব্যালাডস-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনায় এই রীতি পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথাসর্বস্বতা, শৃঙ্খলা, ছন্দোবদ্ধ পদবিন্যাস ও যুগ্ম-পায়ারের একাধিপত্য বর্জন করে রোমান্টিক কবিরা এক অকৃত্রিম শৈলী ও সহজ সরল শব্দচয়ন (diction)-এর কথা বলেছিলেন। অগাস্টান যুগের শৃঙ্খলাসর্বস্ব, অলঙ্কৃত ভাষা ও কৃত্রিম কাব্যরীতির পরিবর্তন ছিলো রোমান্টিক কাব্যান্দেলনের স্বীকৃত লক্ষ্য।

রোমান্টিক কবিসম্প্রদায় -

রোমান্টিক কবিদের প্রথম প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত হলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ এবং সাদে। এদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও তার ভগ্নী ডরোথির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ ছিলো কোলরিজের। লিরিকাল ব্যালাডস্ ছিলো সেই ভ্রাতৃপ্রতিম বিনিময়ের উৎকৃষ্ট ফসল। কোলরিজের এই পর্যায়ের রচনায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রভাবের নিশ্চিত স্বাক্ষর লক্ষ করা যায়। রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের জ্যেষ্ঠ কবিব্যক্তিত্ব ওয়ার্ডসওয়ার্থ। রোমান্টিক সাহিত্যপর্ব অনেক সময় 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর যুগ' বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এই যুগের দ্বিতীয় প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন বায়রন, শেলি ও কিটস। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমকালেই বায়রনের। কবিখ্যাতি ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলো, যদিও ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় এ নিজ ঔদ্ধত্যের কারণে আপন দেশে তিনি সমাদৃত হন নি। দেশবাসীর ঘৃণা শেলির ওপরও বর্ষিত হয়েছিলো। দেশত্যাগী শেলি ইতালিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক হতাশা ও বেদনার মাঝে কবি কিটস তার স্বল্পায়ু জীবনে মগ্ন থেকেছেন সুন্দরের তন্ময় ধ্যানে।

৮.৫ অনুশীলনী

১। রোমান্টিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

২।রোমান্টিক আন্দলনে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করো।

৩।রোমান্টিকতার লক্ষণগুলি আলোচনা করো।

৪।লিরিক্যাল ব্যালাডস সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১।Hisory of modern criticism –Rene Wellek

২।Literary criticism: A short history-Wilmsatt.J.& books

৩।The mirror and the lamp-M.H Abrams

একক ৯ - রোমান্টিকতার কবি

বিন্যাসক্রম

৯.১ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ

৯.২ অনুশীলনী

৯.৩ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ

কবিতার নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজ কবি যিনি সৃজন-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবিতার বিষয় ও প্রকরণসহ তার নান্দনিক স্বরূপকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁর ও কোলরিজের যৌথ কাব্যসংকলন 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ‘মুখবন্ধে’। ১৭৯৮ সালে প্রথম প্রকাশিত গাথাকবিতার এই যুগান্তকারী সংগ্রহে কোনো ভূমিকা বক্তব্য ছিলো না; যা ছিলো তা একটি বিজ্ঞাপনধর্মী প্রস্তাবনা (Advertisement)। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে এই বিজ্ঞাপনের জায়গায় অন্তর্ভুক্ত হয় ওয়ার্ডসওয়ার্থের মুখবন্ধ (Preface)। ১৮০২-এর সংস্করণে এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'What is usually called Poetic Diction' শিরোনামের একটি সংযোজনী (Appendix) যা পরবর্তী সংস্করণগুলিতে একাধিকবার পরিমার্জিত হয়েছে।

লিরিক্যাল ব্যালাড্স’-এর এই বিশ্লেষণী মুখবন্ধ টি ওয়ার্ডওয়ার্থের কাব্যতত্ত্বচিন্তার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। যদিও এই ভূমিকা-নিবন্ধের নান্দনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রসঙ্গ তথা উপাদানসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী দার্শনিক-সমালোচক-নন্দনতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত, তবুও ওয়ার্ডসওয়ার্থ এখানে যেভাবে তার নিজের কাব্য-সৃজন প্রক্রিয়াকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কাব্য-সংকলনের জন্য এ ধরনের মুখবন্ধ লেখায় অবশ্য ওয়ার্ডওয়ার্থের কোনো আগ্রহ ছিলো না। পরমসুহৃদ ও সহযোগী কোলরিজের তাগিদেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ মুখবন্ধটি লেখেন, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো সংকলনভুক্ত কবিতাগুলিকে, বিশেষতঃ তার নিজের উনিশটি রচনাকে, এডিনবার্গ ও কোয়ার্টারলি রিভিউ-র নব্য-পদী (Neo-classicist) সমালোচকদের আক্রমণের হাত থেকে সসম্মানে মুক্ত করা। কোলরিজের পরামর্শে লিখিত হলেও এই 'মুখবন্ধ টিতে তার বন্ধুর কবিতাগুলি নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ আলোচনা করেন নি। কোলরিজের প্রতি এ বিষয়ে কোনো ঋণও স্বীকার করেন নি ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তাই বলা যায় যে 'প্রিফেস টু দি লিরিক্যাল ব্যালাডস' ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই কাব্যভাবনার স্বনির্ভর অভিজ্ঞান।

কবিতা কি এবং তার মূল্যই বা কিসে, এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবির প্রকৃত সৃজন কর্মপদ্ধতির অন্তঃপুরে আলো ফেলতে চেয়েছিলেন। 'প্রিফেস'-এর তার কাব্যজিজ্ঞাসা শুরু হয়েছিলো মূলতঃ এই প্রশ্নগুলিকে ঘিরে–'কবি কে?' 'কবি কাকে উদ্দেশ করে লেখেন?' 'কবির কাছ থেকে কোন ভাষা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি?' কবিতা যেমন একটি বিশেষ শিল্পরূপ, তেমনি তা এক সৃজন-কর্মপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বুঝেছিলেন যে সমগ্র প্রক্রিয়াটি বোঝা ও ব্যাখ্যা করা না গেলে কবিতার স্বরূপ ও শিল্পবৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কবিকে বর্ণনা করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক প্রাণিত, অনুভবী, প্রজ্ঞাবান, সানন্দ ব্যক্তিসত্তারূপে যিনি মহাবিশ্বের বিপুল ও রাহসিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আপন মানস প্রতিমাকে পরিস্ফুট হতে দেখেন।

"He is a man speaking to men : a man, it is true, endowed with me lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a great knowledge of human nature, and a more comprehensive soul, than are supposed to be common among mankind ; a man pleased with his own passions and volitions, and who rejoices more than other men in the spirit of life that is in him: delighting to contemplate

similar volitions and passions as manifested in the goings on of the Universe, and habitually impelled to create them where he does not find them."

কবি এমন একজন মানুষ যিনি অপরাপর মানুষদের কাছে জীবন ও প্রকৃতির এক আবেগমণ্ডিত, আনন্দঘন প্রতিভাস মূর্ত করে তোলেন। কবির এই মানবিক অবস্থান, নিজ আবেগ-প্রত্যয়ে জীবনের শিল্পিত ও সানন্দ রূপ অন্যান্য মানুষদের কাছে মেলে ধরা, তাৎক্ষণিক ব্যক্তিসত্যকে এক সাধারণ ও সক্রিয় চিরসত্য উত্তীর্ণ করা—এসবই ওয়ার্ডসওয়ার্থের নন্দনভাবনার মৌল স্বীকার্য।

আপামর কাব্যভাবনার মুলার, 'পোয়েটিক্স্'-প্রণেতা অ্যারিস্টটল-এর সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সহমত ছিলেন যে কবিতা সকল প্রকার রচনার মধ্যে সর্বাধিক দর্শনভাবনাঋদ্ধ। কবিতার লক্ষ্য সত্য ; কিন্তু সে সত্য স্বতঃসিদ্ধ, কবির আবেগের আন্তরিক দৃপ্ততায় বাহিত, সজীব ও সক্রিয়। এই সত্যই আনন্দের বার্তাবহ ; আর কবিতার মূল্য এই আনন্দবিধানে। ইতিহাসের সত্যকে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন 'নিদিষ্ট' (Particular) ; অন্যদিকে কাব্যসত্য 'বিশ্বজনীন' (Universal)। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই তারতম্যকে স্বীকার করে নিয়ে কাব্যসত্যকে একটি পূর্ণ মাত্রা দিলেন। তাঁর কাছে এই সত্য ক্রিয়াশীল বা অপারেটিভ ; কবির আবেগ। এই সত্যকে বহন করে নিয়ে যায় পাঠকহৃদয়ে যেখানে তা স্বীকৃত হয় তার স্বাশ্রয়ী মূল্যে। সুজন-প্রক্রিয়ায় কবিমানসের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে অ্যারিস্টটল-ওয়ার্ডসওয়ার্থ একমত ছিলেন না।

'আনন্দ' বা 'Pleasure' যা কবিতাসহ যে কোনো সৃজনী-শিল্পের সার কথা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অষ্টাদশ শতকের নিও-ক্লাসিক্যাল সমালোচনার উজানে, তাকেই নিঃসংকোচে পুনর্বাসিত করেছেন 'প্রিফেস'-এর মৌল প্রতিপাদ্যে-

"The poet writes under one restriction only, namely, the necessity of giving immediate pleasure to a human being possessed of that information which may be expected from him not as a lawyer, a

physician, a mariner, an astronomer, or a natural philosopher, but as a man."

এই আনন্দের উপলব্ধি ও তার প্রকাশই ওয়ার্ডসওয়ার্থের নন্দনভাবনার সারাৎসার। এর মূল্যেই কবিতার মুল্য; আর আনন্দবিধায়ক বলেই কবি, তাঁর পাঠকদের মতো, গুণগত বিচারে একজন সাধারণ মানুষ হয়েও পরিমাণগত বিচারে স্বতন্ত্র। এছাড়া কবিতার আনন্দের স্বরূপও বিজ্ঞান কিম্বা দর্শনের আনন্দের থেকে আলাদা।

নব্য ধ্রুপদী সমালোচকদের প্রকরনসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভালো কবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাতে অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রবল প্রকাশের কথা ছিলো - “All good poetry is the spontaneous overlow of powerful feelings.” কবি নিছক একজন কারিগর নন যিনি পূর্বসূরিদের অনুবর্তন এবং প্রথা-প্রকরণের নিয়মানুশীলনেই নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন। কবি একজন আনুভবী দ্রষ্টা, এক অতি সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব, প্রশান্তি যাঁর সৃষ্টির মূল সুর, গভীর অনুধ্যান যাঁর সৃজনক্ষেত্র, স্বতস্ফুর্তিই যাঁর কুললক্ষণঃ

“Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings : it takes its origin from emotion recollected in tranquility; the emotion is contemplated by a species of reaction the tranquillity gradually disappears, and an emotion, similar to that which was before the subject of contemplation, gradually produced and does itself actually exist in the mind.”

কাব্যসৃজনের এই মানস প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা উনিশ শতকের প্রারম্ভে শুধু অভিনব ছিলনা, পূর্বতন নব্য-ধ্রুপদী কাব্যতত্ত্বের পরিপন্থী তথা অভিজ্ঞতাবাদী (Empiricist) দর্শন ও বিজ্ঞান ভাবনার আধিপত্য থেকে মানব-মনের মুক্তির নির্দেশক ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার এই আদর্শ। কোনো নির্দিষ্ট ভাষারীতি বা প্রকরণ সৌকর্যে নয় ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিকে চিহ্নিত করেছিলেন তার বেদ্যমানতার গভীরতায়, তাঁর আবেগ বাহিত মননের গুঢ়তলচারিতায়, ফর্ম-ডিকশন-মিটার ইত্যাদি যেখানে আনুষঙ্গিক অলঙ্কারমাত্র।কবিতার

সত্য সাশ্রয়ী ও চিরন্তন; তার আনন্দ অক্ষয় ও রাহসিক; কবিতা সমস্ত প্রজ্ঞার প্রথম ও শেষ কথা।

"... Poet binds together by passion and knowledge the rust empire of human society, as it is spread over the whole earth, and over all time. The objects of the poet's thoughts are everywhere; though the eyes and senses of man are, it is true, his favourite guides, yet he will follow where ever he can find an atmosphere of sensation in wliich to move his wings Poetry is the first and last of all knowledge..."

বুঝতে অসুবিধে হয়না যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা সমূহকে স্বীকার করে নিয়েও ওয়ার্ডসওয়ার্থ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন ইন্দ্রিয় নির্ভর জগতের সীমার ঊর্ধ্বে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার সংজ্ঞা ও কাব্য সৃজন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা একটু খুঁটিয়ে দেখলে তাতে এক পরস্পরবিরোধী তার সন্ধান মেলে।"The spontaneous Overflow of powerful feelings" এবং "emotion recollected in tranquility" একেবারে বিপরীতধর্মী ব্যাপার। প্রথমটি চকিত স্বতোৎসারিত ও উদ্দীপনামন্ডিত; পরেরটি এক শান্ত, স্মৃতিচারণ। অবশ্য এই বিরোধিতার নিরসন হতে পারে যদি আমরা দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করি, কারণ উদ্ধৃত অংশে "emotion recollected in tranquility" প্রক্রিয়াটিকে বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Tintern Abbey', 'The Solitary Reaper', 'The Daffodils' এর মতো বহু-পঠিত কবিতাগুলিকে এই সৃজন প্রক্রিয়ার উদাহরন রয়েছে।

The beauteous forms./ Through a long absence. have not been to me/As is a lands cape to a blind man's eye:/ ...I have owed to them/ In hours of weariness, sensations swedt/Felt in the blood, and felt along the hearts And passing even into my purer mind, / With tranquil restoration ..."(Tintern Abbey)

"For oft when on my couch I lie /In vacant or in pensive mood,/ They flash upon that inward eye/ Which is the bliss of solitude." (The Daffodils)

নৈর্ব্যক্তিক কাব্যাদর্শের প্রস্তাবক কবি-সমালোচক টি.এস. এলিয়ট তার 'Tradition and the Individual Talent' প্রবন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় কাব্যভাবনা, বিশেষতঃ 'emotion recollected in tranquillity' সূত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। এলিয়টের নৈব্যক্তিকতা তত্ত্বের সারবত্তা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ না করেও বলা চলে যে এলিয়ট যেভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে ধ্রুপদী, বৌদ্ধিক নন্দনচিন্তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, যদিও ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি এলিয়টের নিরপেক্ষ সুবিচারের ছাপ সে বিশ্লেষণে ছিল না।

বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য ও আনন্দ তথা প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার এক ও অদ্বিতীয় বিষয়। 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর পরিকল্পনাকালে কোলরিজ 'অতিপ্রাকৃত' ঘটনা ও প্রসঙ্গ নিয়ে লিখবেন আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখবেন 'প্রকৃতি' সম্বন্ধীয় বিষয়ে, এমন বোঝাপড়ার কথা কোলরিজ স্মরণ করেছেন তার 'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া'র। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'প্রিফেসে' বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফুর্ততা বজায় রাখতে সহজ, সাধারণ গ্রামজীবনের থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পরামর্শ দিয়েছেন, কারন নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতামুক্ত এই জীবনেই মানুষ থাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও আনন্দের নিবিড় সান্নিধ্যে। লেক ডিস্ট্রিকের প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সরল, অনাড়ম্বর, প্রাণদ প্রকৃতির মাঝেই মানুষের আবেগ-অনুভূতির যথার্থ পরিণতির সম্ভাবনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

"The principal object...proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life, and to relate or describe them. throughout, as far as was possible in a selection of language really used by men, and, at the same time, to throw over them a certain colouring of imagination, whereby ordinary things should be

presented to the mind in an unusual aspect:...and...o make these incidents and situations interesting by tracing in them...primary laws of our nature... Humble and rustic life was generally chosen, because, in that condition, the essential pussions of the heart find a better soil in which they can attain their maturity, are less under restraint, and speak a plainer and more emphatic language: because in that condition of life our elementary feelings co exist in a state of greater simplicity.... because the manners of rural life germinate from those elementary feeling...are more easily compre hended, and are more durable : and...because in that condition the passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature."

রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো জড়বাদী, যুক্তিবাদী নগরসভ্যতার নিয়মসর্বস্বতা থেকে উদার, অপার, প্রাণময় প্রকৃতি জগতের রহস্যমণ্ডিত সৌন্দর্যে ফিরে যাওয়া। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ছিলেন এই প্রকৃতি চেতনার সর্বাধিক মরমী রূপকার। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ঘোষিত লক্ষ্য 'primary laws of our nature'এর সুলুক-সন্ধান- ড্রাইডেন,পোপ, জনসনদের কাব্যতত্ত্বের থেকে আপাতদৃষ্টিতে খুব দূরবর্তী বলে মনে না হলেও, তাঁর স্বাতন্ত্র এইখানে যে তিনি পূর্বসুরিদের মতো যুক্তি-বুদ্ধি-রূপারোপের অনুশাসনে শৃঙ্খলিত ভদ্রজনের পরিশীলিত ভাষারীতি থেকে সরে এসে সাধারণ পল্লী জীবন থেকে কবিতার উপাদান এবং কাব্যভাষা চয়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন। সুপারিশ করেছিলেন সাধারণ জীবনের ঘটনাবলীকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করতে('a certain colouring of imagination') এই 'কল্পনা শক্তি' রোমান্টিক কাব্য চিন্তার ভরকেন্দ্র; ওয়ার্ডসওয়ার্থের পাঠক মাত্রেই এই কল্পনার ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিচয় পেয়েছেন তাঁর অসংখ্য কাব্য কবিতায়। আর এই 'কল্পনা-

তত্ত্বে'র পূর্ণতর প্রস্তাবনা কোলরিজ করেছিলেন বায়োগ্রাফিয়ায়। বর্তমান প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে।

কবিতার বিষয় তথা ঘটনা-প্রসঙ্গ-পরিবহের মতোই তার ভাষা ও প্রকরণের ক্ষেত্রেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ গুরুত্ব দিয়েছিলেন সহজ স্বাভাবিকতার ওপর। 'ডিকশন' ও স্টাইল এর নিয়মসর্বস্ব কৃত্রিমতা বর্জন করতে বলেছিলেন; গদ্য ও কাব্যের ভাষার মাঝে কোন ভেদরেখা মানতে চান নি ; ছন্দের অলংকারিক মাধুর্যের প্রয়োজনীয়তাই শুধু স্বীকার করেছিলেন ইত্যাদি। কবি যেহেতু একজন বিশেষ মানুষ যিনি অন্যদের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ বিনিময়ে রত, সেহেতু কবিতার আলাদা কোন ভাষা বা ভঙ্গী থাকা সম্ভব বা সঙ্গত নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাই 'a selection language really used by men' এর কথা বলেছেন। যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণমুক্ত, সাবলীল, আবেগদৃপ্ত ভাষার পক্ষে নির্দ্বিধায় ওকালতি করেছেন। বিষয় ও প্রসঙ্গের সহজ স্বতস্ফূর্ত স্বাভাবিকতার পাশাপাশি কবিতার ভাষা তথা কারিগরী কৌশল সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই মতামত পরস্পরের পরিপূরক।

কবির ভাষা আইনবিদ কিম্বা চিকিৎসকের মতো বিশেষজ্ঞের ভাষা নয় ; নিছক ব্যবহারিক উপযোগিতার অশ্লীলতা কিংবা ব্যাকরণ-শাসিত ভাষারীতি নকলনবিশি পরিহার করে কবিকে তার অনুভূতি ও ভাবনাকে ব্যক্ত করতে হবে প্রাঞ্জল ও অনাড়ম্বর সাবলীলতায় : "... they convey their feelings and notions in simple and unelaborated expressions." জোরালো ভাষায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ আক্রমণ করেছিলেন 'পোয়েটিক ডিকশন' এর অষ্টাদশ শতকীয় ধারণাকে। বিভিন্ন আলংকারিক প্রয়োগের মাধ্যমে কবিতার ভাষাকে এক স্বতন্ত্র উচ্চতা দেবার প্রচলিত চেষ্টাকে কৃত্রিম ও বিরক্তিকর বলে রায় দিয়েছিলেন তিনি। সাধারণ মানুষের নিজের ভাষা, যা আতিশয্য ও আড়ম্বর থেকে মুক্ত, তাকেই কবিতার ভাষার আদর্শ বলে ধরেছিলেন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, যে ভাষায় বাহ্যিক সৌন্দর্যবিধানের জন্য ছন্দমিলের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা তার মৌল শর্ত বলে, অলংকার বা মিলের কোন অপরিহার্যতা সেখানে নেই। কবিতা ও গদ্যের মধ্যে কোন কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন না

ওয়ার্ডসওয়ার্থঃ '... not only the language of a large portion of every good poem, even of the most elevated character, must necessarily, except with reference to the metre, in no respect differ from that of good prose, but likewise that some of the most interesting parts of the best poems will be found to be strictly the language of prose when prose is well-written.' গ্রে'র লেখা 'a Sonnet on the Death of Richard West' থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে অন্ত্যমিল বাদ দিলে উদ্ধৃত কাব্যাংশ এবং গদ্যের ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অবশ্যই ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে কতখানি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য সহজ ভাষায় কাব্যাচর্চা করেছেন, তার কবিতার 'ডিকশন' এ 'স্টাইল' সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণগুলি কতখানি স্বকীয় তথা বিপ্লবাত্মক তা নিয়ে বিস্তর মতবিরোধ হয়েছে। তাঁর 'selection of language really used by men'-এর ঐ 'selection' শব্দটিই কি এক ধরনের প্রকরণ-শৃঙ্খলার ইঙ্গিতবাহী নয়? আর এই প্রসঙ্গে তিনি তো বলেছেন যে, "this selection, wherever it is made with true taste and feeling, will of itself form a distinction far greater than would at first be imagined, and will entirely separate the composition from the vulgarity and meanness of ordinary life; and if metre be superadded thereto, I believe that a dissimilitude (i. e. distinction) will be produced altogether sufficient for the gratification of a national mind.' কার্যতঃ এখানে কবিতার ভাষাকে মানুষের মুখের ভাষা বা গদ্যের ভাষা থেকে আলাদা করা হয়েছে। অন্যত্র ওয়ার্ডওয়ার্থ এমনও বলেছেন যে কবি যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে তার বিষয় নির্বাচন করেন সেই বিষয় তাকে এমন আবেগময়তার অভিমুখে নিয়ে যাবে যা কবিকে জোগাবে এক মর্যাদাসম্পন্ন, বৈচিত্রপূর্ণ ভাষা, রূপক ও অলংকারে মণ্ডিত—'dignified and variegated, and alive with metaphors and figures. এ যেন অনেকটা বাড়ি থেকে পালানো ছেলের শেষ পর্যন্ত ঘুরে ফিরে ঘরে ফিরে আসা, যে বিষয়টি রেনে

ওয়েলেক দেখেছেন এইভাবে –'Wordsworth actually ends in good neo-classicism.' ওয়ার্ডওয়ার্থের নন্দনভাবনায় জন লকের জড়বাদী-অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন ও ডেভিড হার্টিলির অনুষঙ্গবাদী মনস্তত্ত্ব (associationist psychology) যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলো বলে মনে করা হয়। সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর কবিতার ভাষা ও প্রকরণ বিষয়ক ধারণাগুলি ড্রাইডেন-পোপ জনসন প্রমুখের নব্য-ধ্রুপদী কাব্যাদর্শের থেকে মূলগতভাবে খুব সরে গিয়েছিলো এমন নয়। স্পষ্টতঃই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার সংজ্ঞা বা সৃজন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে স্ববিরোধের লক্ষণ ছিলো। ওয়েলেকের সঙ্গে পূর্ণ সহমত প্রকাশ না করেও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যতত্ত্বচিন্তায় তার পূর্বর্তন কবি-দার্শনিকদের ঋণ উপেক্ষা করা চলে না।

তবুও কাব্যতত্ত্বচিন্তার ইতিহাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্মরণীয় একাধিক উল্লেখযোগ্য কারণে। কবিতা তাঁর কাছে কারিগরী নয় যে তার গঠনরূপ, ডিকশন ও মিটার দিয়ে তাকে বিচার করে ফেলা যাবে। কবি এমন একজন মানুষ যিনি উদার, উন্মুক্ত, প্রাকৃতিক পরিবহে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন মানবজীবনের গভীরে, অনুভব ও চিন্তার দ্রুততায় এক পরম সত্যকে দেবেন সহজ, সানন্দ বাণীরূপঃ " ...the poet is chiefly distinguished from other men by a greater promptness to think and feel without immediate external excitement, and a greater power in expressing such thoughts and feelings as are produced in him in that manner." ওয়ার্ডসওয়ার্থের দৃষ্টিতে কবি আধুনিক যান্ত্রিক ও জড়বাদী জীবন থেকে মুক্ত এক সহজিয়া মানব-ব্যক্তিত্ব, ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রাণ-পুরুষ রুশো বর্ণিত "Man in the natural state" কবিতার সার্থকতা ভাষা ও আঙ্গিকের দক্ষতায় নয়, তার আনন্দবিধায়ক শক্তিতে; আর সে 'আনন্দ' কেবলমাত্র শৈল্পিক নয়, তা নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক। লক—হার্টলির কাছে, ঋণ থাকলেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার সৃজনচিন্তায় মানবমনের সচেতনতা ও সক্রিয়তাকে, আংশিক হলেও, স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদী বিজ্ঞান যা উত্তরাধিকার হিসেবে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে দিয়েছিলো এক 'প্রাণহীন হিমবিশ্ব' (inanimate cold

world); তাকেই তার অন্তর্নিহিত ‘সৃজনী কল্পনায়’(plastic power) তিনি পরিণত করেছিলেন এক ‘সজীব বিশ্বে’ (active universe)। এই “plastie power"-ই কবিত্ব যা' মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতিকে গ্রথিত করে। কবিতার এই অন্তর্গত রহস্য কি চমৎকার উন্মোচিত করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ ‘দ্য প্রেলিউড’ -এর ত্রয়োদশ খণ্ডাংশের শেষ লাইনগুলিতেঃ

‘...I remember well/That in life's every-day appearances/I seemed about this time to gain clear sight/of a new world- a world, to, that was fit to be transmitted, and to other eyes/Made visible: as ruled by those fixed Laws/Whence spiritual dignity originates, /Which do both give it being and maintain/A balance, an ennobling interchange/Of action from without and from within..."

ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের যে নিবিড় সহমর্মিতা রচনা করেছিলো ‘লিরিক্যাল ব্যালাডস্’ এর মতো কাব্যসংকলন তথা সমগ্র রোমান্ট্রিক আন্দোলনের আবেগ ও মননের প্রেক্ষাপট, সেই বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব-বিনিময় ছিলো এত দীর্ঘস্থায়ী ও প্রবাদপ্রতিম মিথোজীবিতার নিদর্শন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘প্রিফেস' লেখার তাগিদ এসেছিলো কোলরিজের কাছ থেকে এবং এই মুখবন্ধেই নিহিত ছিলো কোলরিজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা ‘বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া’ (১৮১৭)-র বীজ। কবিতার বিষয় ও তার ভাষারীতির সঙ্গে প্রকৃত জীবন ও মানুষের মুখের ভাষার সম্পর্ক নিয়ে যে ব্যাখ্যা ও উত্তরগুলি ওয়ার্ডসওয়ার্থ উপস্থিত করেছিলেন তাঁর ‘প্রিফেসে’, সেগুলিকেই নতুন করে পরখ করে দেখেছিলেন কোলরিজ তার ‘বায়োগ্রাফিয়া’য়। কোলরিজের কাব্যচিন্তা তথা নন্দন ভাবনায় শুধু নয়, ইংরাজী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার ধারায় ‘বায়োগ্রাফিয়া’ এক অনন্য প্রয়াস, যেখানে সৃজন প্রক্রিয়ার সারবত্তাকে উদঘাটিত করেছেন কোলরিজ দর্শন ও সাহিত্যের মাঝে এক কার্যকারণ সূত্র আবিস্তার করে। দর্শন, বিশেষত মেটাফিজিক্স ছিলো কোলরিজের নিজস্ব অধিক্ষেত্র । মনস্তত্ত্বে তার ছিলো স্বাভাবিক আগ্রহ :

‘বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া’ তাই হয়ে উঠেছিলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অভিমত, তথা দার্শনিক ও নন্দনচিন্তার এক আশ্চর্য সংবেদনশীল, আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞান।

দুই খণ্ডে প্রকাশিত ‘বায়োগ্রাফিয়া'র প্রথম খণ্ডের শেষ অর্থাৎ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ এবং মধ্য দ্বিতীয় খণ্ড (পরিশে ১৪ থেকে ২২) এই গ্রন্থের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত অংশ। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কোলরিজ সংজ্ঞা দিয়েছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন ‘কল্পনা’ (Imagination)-কে যা কবি-প্রতিভার সেই শক্তি যা বিভিন্ন রূপকল্পকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত কাব্যরূপ প্রদান করে, যাকে কোলরিজ বলেছেন 'Esemplastic Power.' সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় কবিতার ভাষা ও বিষয়বস্তু। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য-কবিতাকে অবলম্বন করে এই বিশ্লেষণী আলোচনা চালিয়েছেন কোলরিজ আর এর মধ্য দিয়েই ‘প্রিফেস’-এর উত্তর বা সিদ্ধান্তগুলি নানাভাবে সংশোধিত বা পরিমার্জিত হয়েছে।

মধ্যযুগীয় ও তার পরবর্তী নবজাগরণের যুগপর্বে ব্যবহৃত "imaginatio" এবয় “phantasia” শব্দ দুটির মতো ‘imagination’ ও ‘fancy’ সপ্তদশ শতকেও প্রায় সমার্থক ছিলো। ক্রমে ‘imagination’ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব পেতে থাকে সংবেদবাদী নন্দনচিন্তায়। অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদী, জড়বাদী, অভিজ্ঞতাবাদী দর্শনচর্চার ঐতিহ্যে ‘কল্পনা’ বা imagination কে সাধারণভাবে খেয়ালীপনা" বা "fancy'-র সমগোত্রীয় এবং যুক্তি বা ‘reason’-এর পরিপন্থী হিসেবে দেখানো হয়। হবস, লক, হিউম, হার্টলি প্রমুখের অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্বাদর্শ (empirical epistemology) ও তার ওপর গড়ে ওঠা নন্দনচিন্তার পরিমণ্ডল থেকে বার করে এনে কোলরিজ ‘কল্পনা’কে দিলেন এক নতুন ব্যাঞ্জনা ; তাকে দেখালেন এক সজীব মানস-শক্তি রূপে, যা বহু বিচিত্র বৈপরীত্যকে দেয় এক সংহত, প্রাণবন্ত, অভাবিত সৃজনীরূপ :

“The imagination then, I consider either as primary. or secondary. The primary imagination I hold to be the living power and prime agent of all human perception, and as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I AM. The

secondary I consider as an echo of the former, co-existing with the conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its agency, and differing only in degree, and in the mode of its operation. It dissolves, diffuses. dissipates, in order to recreate : or where this process is rendred impossible, yet still, at all events, it struggles to idealize and to unify. It is essentially vital, even as all objects (as objects) are essentially fixed and dead."

লঘু-চপল, খণ্ড-বিক্ষিপ্ত 'খেয়ালীপনা' (fancy) থেকে শুণগতভাবে স্বতন্ত্র এই 'কল্পনা এক শাসিত, অভিনব সৃজনীশক্তি যা কবিকে করে তাোলে প্রকৃত অর্থেই স্রষ্টা। কোলরিজের এই সৃজনী কল্পনা'র ধারণাই রাোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের মৌল সূত্র। এখানে কোলরিজ শুধু কল্পনার মূল চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকেই চিহ্নিত করেন নি, কাব্যসৃজনের প্রক্রিয়ায় তার অপরিহার্য। ভূমিকার ইঙ্গিত দিয়েছেন ; পরিমাণগত ভিত্তিতে দু'প্রকার কল্পনার অস্তিত্ব নির্দেশ করেছেন যথা, প্রাইমারি' ও 'সেকেণ্ডারি।

আট।

অষ্টাদশ শতকে মানবমনকে দেখা হয়েছিলাে ইন্দ্রিয়-সংবেদনসমূহের এক নিস্ক্রিয় সংগ্রাহক (passive recorder) রূপে। জন ল মন'কে বলেছিলেন "a tabula Talsa', অর্থাৎ একটুকরাে সাদা কাগজ, "void of all clia'acters, without any idels." মা নিরন্তর। সংগ্রহ কনের ইজি-ল সংবেদনগুলি আর এইসব সংবেদন বা তাদের প্রতিচ্ছবি সত্যি হয় স্মৃতিতে এবং স্মৃতি থেকে সেগুলি উঠে আসে অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ায়। স্পষ্টতঃই লক ও তার অনুসারীদের দর্শনতত্ত্ব ও নিউটনীয় বিজ্ঞয়ানের দ্বারা প্রভাবিত যুক্তি ও গদ্যের এই যুগে কবিতা ছিলাে বৌদ্ধিক সরসত্তা বা "\wit'-এর চর্চা, যার মুল্যায়ন হতাে ভাষা-প্রকরণের নিরিখে। অভিজ্ঞতাবাদী তত্তাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত নব-দ্রুপদী নন্দনতত্ত্বে কোলরিজের। কল্পনার কোন স্থান ছিলাে না; কল্পনাকে টমাস হবস বলেছিলেন 'decalying sense" আর স্যামুয়েল জনসনের ইংরাজী ভাষার অভিধানে 'কল্পনার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিলাে, "Fancy: the power

of forming ideal pictures." o useaua es সারসংক্ষেপ ছিলাে উইলিয়াম শডউইনের নিম্নোক্ত বক্তব্যে :

The human mind so for as we are acquainted with it, is nothing else but a suculty of perception... All the minds that exist, set out from

absolute ignorance. They received first one impression, then a second. As the impressions become more numerous, and were stored up by the help of memory, and combined by the faculty of association, so the experience increased, and with the experience the knowledge, the wisdom. everything that distinguishes man from what we understand by cold of the valley'.

এই অভিজ্ঞতাবাদী-সংবেদবাদী নন্দনধারণাকে খণ্ডন করেছিলেন কোলরিজ তার ‘বায়োগ্রাফিয়া’র ‘কল্পনা'তত্ত্বে। কল্পনাকে তিনি পৃথক করলেন “খেয়ালীপনা' থেকে । ‘খেয়ালীপনা' বা Fancy এক যান্ত্রিক শক্তি বা নিছক ইন্দ্রিয়-সংবেদনগুলিকে একত্রিত করে; অন্যপক্ষে Imagination এর সঞ্জীবনী শক্তি বা ‘dissolves, diffuses, dissipates, in order to re-Create’, যার কাজ প্রতিস্পর্ধা উপাদানসমূহের ভারসাম্য বা সমন্বয় সাধন- ‘the balance or reconciliation of opposite or discordant qualities.’ এই ‘বৈপরীত্যের মিলন’ (‘union of opposites’) শ্লেগেলের দর্শনচিন্তায় পরিণত হয়েছিলো জার্মান রোমান্টিকতার মূল সূত্রে । শ্লেগেল, কান্ট সহ জার্মান অতীন্দ্রিবাদী দর্শনভাবনার সঙ্গে কোলরিজের ছিলো নিবিড় মানস-সাহচর্য। কোলরিজ ‘কল্পনা’কে দেখেছিলেন ‘স্মৃতি’ (memory)-র অংশ হিসেবে নয়, যা নব্য-ধ্রুপদীদের ব্যাখ্যানুযায়ী ‘aggregative and associative’, দেখেছিলেন সজীব ও প্রাণদ শক্তিরূপে, যা, ‘বোধ’ (perception), ‘স্মৃতি’ (Memory), ‘অনুষঙ্গ’ (Association), 'অনুভূতি’ (Feeling) ও ‘বুদ্ধি’ (Intellect)-এর এক সংশ্লেষ।

তাঁর নন্দনভাবনার প্রাথমিক পর্যায়ে কোলরিজের ওপর জড়বাদী অভিজ্ঞতাবাদী বিজ্ঞান ও দর্শন, বিশেষতঃ হার্টলির সংবেদবাদী তত্ত্ব, অবশ্যই প্রভাব ফেলেছিলো। ১৭৯০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত কোলরিজ 'Imagination' ও 'Fancy"কে সমার্থক হিসেবে যুক্তির পরিপন্থী, অধ্যাস (illusion)-সৃষ্টিকারী যান্ত্রিক শক্তিরূপে দেখেছিলেন। তবে এরই মধ্যে ১৭৯৮-এ জন উইকস্টিভকে লেখা একটি চিঠিতে ও দু'বছর বাদে লেখা অন্য আর একটি চিঠিতে নব্য-ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব তথা অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন-কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার সংকেত ছিলো কোলরিজে। এছাড়া ১৭৯৫-এর 'দ্য স্লেভ-ট্রড লেকচার'-এ ছিলো তার 'প্রাথমিক কল্পনা' (Primary Imagination)-র ধারণার বীজ। পরের বছর 'দ্য ডেসটিনি অব নেশনস'-এ কোলরিজ দেখিয়েছিলেন কিভাবে Fancy ও Imagination অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবমনকে ইন্দ্রিয়ানুগত্য থেকে মুক্ত করে (insensualises the dark mind)। এইভাবেই হার্টলিয় মনস্তত্ত্ব থেকে, জড়বাদী তত্ত্বাদর্শের আধিপত্য থেকে, কোলরিজ ক্রমে পরিণত হচ্ছিলেন নিও-প্লেটোনিক চিন্তাভাবনার সড়ক ধরে, যার চূড়ান্ত গন্তব্যে ছিলেন ইমানুয়েল কান্ট ও কান্টীয় ভাববাদী দর্শনবিদেরা। কোলরিজ স্বয়ং তাঁর এই ক্রম-পরিণতি মানচিত্রটি পরিস্ফুট করেছিলেন 'বায়োগ্রাফিয়া'র পঞ্চম থেকে নবম পরিচ্ছেদে।

১৭৯৭-এর অক্টোবরে টমাস পুলকে লেখা চিঠিতে কোলরিজ ব্যক্ত করেছিলেন তার বাল্যকাল থেকে লালিত এক বিশ্বাসবোধ । কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়শাসিত অভিজ্ঞতাসমূহের উর্ধ্বে এক বিশাল বিপুল মহাবিশ্ব : ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত নয়, সে এক ইন্দ্রিয়াতীত মহাসমগ্র । 'বায়োগ্রাক্রিয়া'য় যাকে তিনি বলেছিলেন 'despotism of the eye.', অর্থাৎ সব ভাবনাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পে প্রকাশ করার গা-জোয়ারি, সেই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে মনে মনে ছিলো তার দীর্ঘ প্রস্তুতি। মহাবিশ্বের এই সমগ্রতা ও তার অন্তর্লীন ঐক্যের দার্শনিক অস্তিপ্রত্যয় কোলরিজ উপলব্ধি করেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায়, করেছিলেন ১৭৯৫ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে তার সাক্ষাতের পরবর্তী বছরগুলিতে নিবিড় অনুধ্যানের মধ্যে। 'বায়োগ্রাফিয়া'য় কোলরিজ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন কিভাবে Fancy ও Imagination এর প্রভেদ ধরা পড়েছিলো তাঁর কাছে। এর

অনেক পরে, ১৮০২-এর মাঝামাঝি সময় থেকে উইলিয়ম সুদবিকে লেখা পত্রগুচ্ছে কোলরিজের ‘কল্পনা'র ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে; "Fancy'-র সঙ্গে ভেদরেখাটিও চিহ্নিত হয়। একই সময়ে লেখা ‘ভার্স লেটার টু সারা হাচিনসন’ কবিতায় মানবমনের এই সৃষ্টিশীল শক্তির কথা উল্লেখ করেন কোলরিজঃ

“Ah! from the soul itself must issue forth

A light, a glory, and a luminous cloud

Enveloping the Earth!

And from the soul itself must there be sent

A sweet and potent voice, of its own birth ,

Of all sweet sound the life and Element.”

এক সজীব ও বিপুল মহাবিশ্ব তথা ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের ধারণা তাকে আকৈশোর আকর্ষণ করলেও, কেমব্রিজের প্লেটোপন্থী দার্শনিক রাল্ফ কার্ডওয়ার্থের ‘ট্রু ইনটেলেকচুয়াল সিসটেম অব দ্য ইউনিভার্স’ (১৭৪৩) বইটি কোলরিজকে দিয়েছিলো হার্টলিয় তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যাত করার দার্শনিক কাঠামো ও সমর্থন। ওয়ার্ডওয়ার্থের রচনায় ও সান্নিধ্যে যে রাহসিক উত্তরণের পথনির্দেশ ছিলো, সুদবির কাছে লেখা পত্রগুচ্ছে ‘কল্পনা'র যে স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিলো, তারও আগে ‘দ্য স্লেভ-ট্রেড’ লেকচারে ‘প্রাথমিক কল্পনার’ যে তত্ত্বাভাস ছিলো, কাডওয়ার্থের ‘প্লেটোনিক প্যানথিইজম’ তার চুড়ান্ত পরিণতির ভাবক্ষেত্রটি তৈরী করে দিলো।

১৮০২-এ প্রকাশিত “লিরিক্যাল ব্যালাডস’-এর তৃতীয় সংস্করণে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘মুখবন্ধ’ পরিমার্জিত হয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় ‘পোয়েটিক ডিকশন’ বিষয়ে একটি সংযোজনী। আর এই সময় থেকে কোলরিজের নন্দনভাবনার দূরত্ব তৈরী হতে থাকে। ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় তত্ত্বের পেছনে ছিলো ডেভিড হার্টলির ‘অবজারভেশন অন ম্যান'-এর সংবেদবাদী অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার ভাবনা। অন্যদিকে জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবাদর্শের

প্রভাবে কোলরিজ মানবমনের সক্রিয়তা তথা কবিমানসের সক্রিয়তা তথা কবিমানসের সচেতন শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। এরই পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ হয় 'বায়োগ্রাফিয়া'য়।

'কল্পনা'র দুটি পরিমাণগত স্তরভেদের কথা বলেছিলেন কোলরিজ : "প্রাইমারী" ও "সেকেণ্ডারী'। প্রথমটি মানবমনের অসচেতন ক্রিয়া যার দ্বারা মন বিভিন্ন বস্তুর ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান লাভ করে ও তার সৃজনীশক্তিতে নির্মাণ করে বস্তুজগতের এক নিজস্ব রূপ ; অর্থাৎ মনের সক্রিয়তার সংবেদনগুলি পরিবর্তিত হয় বোধে। আর দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই তীব্রতর প্রতিধ্বনি যা এক সচেতন প্রক্রিয়ায় সমস্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রতিমা ও অভিজ্ঞতাকে একীভূত করে এক নব-সৃজনে। এই 'সেকেণ্ডারী ইমাজিনেশন'-ই কবি তথা শিল্পীর সৃজনী-কামনা।

Fancy বা 'খেয়ালী-কল্পনা' থেকে "ইমাজিনেশন'কে পৃথক করেছিলেন কোলরিজ। Fancy আসলে স্মৃতির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যা 'যান্ত্রিক'; নির্বাচিত স্মৃতিচারণার অনুষঙ্গ-নির্ভর বিন্যাসমাত্র; বিভিন্ন বস্তুর এক মিশ্রণ যাতে সৃষ্টিশীলতার কোন ছাপ নেই। Fancy ও Imagination-এর পার্থক্য তাই গুণগত:

"Fancy has no other counters to play with but fixities and definites. The fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space; and blended with, and modified by that empirical phenomenon of the will the which we express by the word choice. But equally with the ordinary memory it must receive all its materials readymade from the law of association."

আলোচ্য পার্থক্য নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'লিরিক্যাল ব্যালাডস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে The Thorn' কবিতাটির নোটে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। এর অনেক পরে ১৮১৫-র কবিতাসংকলন'-এর 'প্রিফেসে' উইলিয়াম টেলরের 'British Synonyms Discriminated'-এ প্রকাশিত ব্যাখ্যাটিকে সরাসরি আক্রমণ করেন ওয়ার্ডওয়ার্থ। অষ্টাদশ শতক থেকে প্রচলিত দুটি সমার্থক শব্দের মধ্যে তিনি স্পষ্টতঃই 'Imagination'কে উচ্চতর আসনে বসিয়েছিলেন, যদিও 'Fancy'কেও এক অভিনব

সৃষ্টিশীল শক্তিরূপে দেখেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং বায়োগ্রাফিয়ার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এ ব্যাপারে কোলরিজ তার ভিন্ন মত পোষণের কথা জানিয়েছেন। তবে উভয়ের ব্যাখ্যা ও অভিমতের মধ্যে ঠিক ব্যবধান কতটুকু তা বিতর্কের বস্তু।

'বায়োগ্রাফিয়া'র চতুর্দশ পরিচ্ছেদে 'কবিতা' বিষয়ে তার ধারণাসমূহের একটি সারসংক্ষেপ এবং কবিতা (Poetry)র 'জৈবিক ঐক্য' (Organic Unity) সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করেছিলেন কোলরিজ। 'কবিতা' তার ভাবনায় 'সেকেণ্ডারী ইমাজিনেশন'-এর সৃজনীশক্তির ফলশ্রুতি। তা সে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কিম্বা ছন্দের মিল বর্জিত, এমনকি গদ্যভাষাতেও রূপায়িত হতে পারে। কোলরিজ মনে করেছিলেন যে ছন্দ বা মিলের সঙ্গে কবিতার অন্তরাত্মার কোন সম্পর্ক নেই ; ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লিখিত হলেই কোন রচনা 'কবিতা হয়ে ওঠে না, তবে মিল বা ছন্দ যদি তার ভাববস্তুর দ্বারা প্রাণিত হয় তাহলে কবিতার আনন্দে জোগান বাড়ে; আর এই 'আনন্দ' বা pleasure-ই কোলরিজের বিচারে সাহিত্যের প্রাথমিক লক্ষ্য যা নিয়ে যায় গভীরতর সত্যের দিকে। 'কবিতা' বা 'poetry'-র একটি বিশেষ বাণীরূপ হোলো 'একটি কবিতা', কোলরিজ যাকে বলেছেন "a poem,' এক বিস্তৃত ও সামগ্রিক সৃজনীদৃষ্টির একটি বিশিষ্ট, অভিব্যক্ত, শাব্দিক অবয়ব। এই সূক্ষ্ম তারতম্য স্পষ্টতর হবে কোলরিজের এই লাইনগুলিতে— "A poem is that species of composition, which is opposed to works of science, by proposing for its immediate object pleasure, not truth, and from all other species (having this object in common with it) it is discriminated by proposing to itself such delight from the whole, as is compatible with a distinct gratification from each component part."

কোলরিজের নন্দনভাবনা ও কাব্যতত্ত্বচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কবিতার অস্তিত্বের স্বরূপ সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। কবিতা তার দৃষ্টিতে ছিলো এক 'organic form,' যা 'বিষয়' (content) এবং গঠনরূপ (form)-এর এক অবিচ্ছেদ্য ও সংশ্লিষ্ট ঐক্য। 'কল্পনা' এই কবিতার জন্মদাত্রী, যার দ্বারা অর্জিত হয় organic unity.' কোন

একটি কবিতা সেই ঐক্যের একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ শাব্দিক প্রকাশমাত্র। সেদিক থেকে দেখলে 'কবিতা' বা poetry এমন একটি সৃজন প্রক্রিয়া যে একজন চিত্রকর কিম্বা দার্শনিক বা সংগীতস্রষ্টাও মূলতঃ কবি।

কোলরিজের নন্দনতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রকৃতপক্ষে 'কবিতা'র অস্তিত্ব ও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলির শিকড়ে পৌঁছোবার চেষ্টা। বলা যায় এবং তত্ত্ববিদ্যানির্ভর তথা Ontological বিশ্লেষণ-দৃষ্টি। ছন্দ, মিল কিম্বা আলংকারিক ভাষারীতির নিরিখে নয়, রূপ ও আঙ্গিকের সৌকর্যের নিরিখেও নয়, কবিতাকে দেখা তার জন্মরহস্যের গুঢ়ত্বের অলোকে, কিভাবে 'একটি কবিতা' হয়ে ওঠে একটি মানব-প্রক্রিয়ার শাব্দিক অভিজ্ঞান। 'একটি কবিতা'র অনেকগুলি অংশ বা উপাদান থাকে; প্রতিটির থাকে স্বতন্ত্র আবেদন ও আকর্ষণ; কিন্তু প্রতিটি আলাদা উপাদানের উৎকর্ষ ও আনন্দ সমগ্র কবিতাটির সামগ্রিক আনন্দের মাঝে লীন হয়ে যায়। ভাষা, আঙ্গিক, বিষয়বস্তু কিম্বা ছন্দ, মিল ইত্যাদির পৃথক তথা সমগ্র নিরপেক্ষ কোন মূল্য থাকে না। কবিকে তাই কোলরিজ বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

"The poet, described in ideal perfection, brings the whole soul of man into activity, with the subordination of its faculties to each other, according to their relative worth and dignity. He diffuses a tone and spirit of unity, that blends, and (as it were) fuses, each into each, by that synthetic and magical power, to which we have exclusively appropriated the name of imagination."

এই 'organic unity'-র কথা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে কোলরিজে। কোলরিজ তাকেই বলেছেন "legitimate poem" যার সমস্ত প্রত্যঙ্গ সমগ্রের মাঝে একীভূত:
"...it must be one the parts of which mutually support and explain each other; all in their proportion harmonizng with, and supporting the purpose and known influences of metrical arrangement."

দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কে সংশয় ছিলো কোলরিজের ; একটি দীর্ঘ কবিতার সবটুকুই ‘কবিতা’, হয় না; তার অংশবিশেষ আমাদের আনন্দ বিধানে সক্ষম। মার্কিন কবি ও গল্পকার এডগার অ্যালান পো কোলরিজের এই অভিমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বলেছিলেন যে ‘a long poem does not exist.' কবিতার ভাষা সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘a selection of language realy used by men' সূত্রকে তিনি সমালোচনা ও সংশোধন করেছিলেন। কোন দুজন মানুষের ভাষা কখনো অবিকল একরকম হতে পারে না; স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তো বটেই, এমনকি একই শ্রেণীভুক্ত দুজনের ভাষা ভিন্ন, তাঁদের জ্ঞান, দক্ষতা ও আবেগের তীব্রতায়। প্রত্যেকের ভাষার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে ; তার শ্রেণী বা গোষ্ঠির সাধারণ লক্ষণগুলিও থাকে তার ভাষায় ; সর্বোপরি, তাতে থাকে সর্বজনীন শব্দ ও বাগধারাগুলি। ব্যক্তিবিশেষের ভাষার থেকে তার একেবারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাদ দিয়ে কিভাবে তাকে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে কোলরিজ তার মতামত দিয়েছিলেন 'বায়োগ্রাফিয়া’র সপ্তদশ পরিচ্ছেদে।

কবিতা ও গদ্য, উভয়েরই মাধ্যম এক ও অভিন্ন; শব্দের মাধ্যমে রূপায়িত হয় এদের অবয়বী অস্তিত্ব। সেদিক থেকে এ দু'য়ে কোন পার্থক্য না থাকলেও শব্দের ব্যবহার ও বিন্যাসে এদের তফাৎ রয়েছে। ‘বায়োগ্রাফিয়া'র অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে তার মতান্তর ও আলোচ্য বিতর্কে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন কোলরিজ। শব্দের কবিতায় সমন্বিত হয় এক স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে, আর সেখানেই গদ্যের গঠনবিন্যাস থেকে তারা আলাদা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পদ্য ও গদ্যের ভাষার মধ্যে কোন ‘essential difference’ খুঁজে পান নি; কোলরিজের ভিন্ন মত ঐ ‘essential'-কে কেন্দ্র করেই। কোলরিজের ‘কবিতা'র ধারণা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ‘metrical composition’ থেকে সম্পুর্ণ মেরুবর্তী। কোলরিজের কাছে ছন্দ কবিতার জীবনীশক্তি, যা কবির আবেগ-অনুভূতির এক স্বতস্ফূর্ত, স্পন্দিত প্রকাশ, যা তার অন্তরাত্মার সঙ্গে ওতপ্রোত।

অষ্টাদশ শতকের নব্য-দ্রুপদী নন্দনভাবনা ও যুক্তি-বুদ্ধি-প্রকরণ শাসিত নগর জীবন-নির্ভর কাব্য-কবিতার বিরুদ্ধে আবেগ ও হৃদয়বৃত্তির এক দ্রোহ সংগঠিত হয়েছিলো "লিরিক্যাল ব্যালাডস" ও তার 'প্রিফেস'-এ, 'বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া'র। কবিতা বা যে কোন শিল্পকর্মকে কেবলমাত্র বাহ্যিক ও প্রাকরণিক গুণাগুণের নিরিখে বিচার করার বদলে তার সৃজনের রহস্য প্রক্রিয়া ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে অনুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন রোমান্টিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষপ্রতিম এই কবিযুগল। শব্দ, ছন্দ, ভাষা ও গঠনরূপের আলোকেই 'কবিতার' সার্থকতা নিরূপণ করার বিরোধী ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ। 'কবিতা'র প্রাণবস্তু হিসেবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'আনন্দে'র কথা বলেছিলেন ; কোলরিজেও তার কেন্দ্রীয় গুরুত্ব। আর কোলরিজ সেই আনন্দের স্বরূপ-সন্ধানে গিয়ে পৌঁছেছিলেন তার কল্পনার ধারণায়। আসলে কোলরিজ মুখ্যত একজন দার্শনিক যিনি কবি বা শিল্পী-মনের সৃষ্টিরহস্যের অতলে ডুব দিতে চেয়েছিলেন একজন সন্ধানী মেটাফিজিসিয়ানের দৃষ্টি নিয়ে। সেইন্টসবেরি তাঁর 'ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে' কোলরিজকে তার দুই যুগন্ধর পূর্বসূরী অ্যারিস্টটল ও লনজাইনাস্-এর সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন।

৯.২ অনুশীলনী

১।ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর রোমান্টিক তত্ত্ব আলোচনা করো।

২।রোমান্টিক তত্ত্বকে কোলরিজ কি রূপ দিয়েছিলেন উদাহরণ সহ লেখ।

৯.৩ গ্রন্থপঞ্জি

১।Hisory of modern criticism –Rene Wellek

২।Literary criticism: A short history-Wilmsatt.J.& books

৩।The mirror and the lamp-M.H Abrams

একক ১০ - রোমান্টিসিজিম এর অন্যান্য কবিরা

বিন্যাসক্রম

১০.১ শেলি ও কীটস্

১০.২ লর্ড বায়রন

১০.৩ অনুশীলনী

১০.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ শেলি ও কীটস্

উপমার ঐশ্বর্য যেমন রোমান্টিক কবিতার সামান্যগুণ, উপমায় অতৃপ্তিও বোধহয় রোমান্টিক কবির তেমনই সহজাত। তাই কি শেলিকে ঘুরে-ফিরে খুঁজতে হয় কবির একটা জুৎসই উপমা? তাই কি কবি তার কাছে কখনো ঊর্ণনাভ, নিজের ভেতর থেকেই গড়ে তোলেন। বিরল ও সুক্ষ্ম মননের তন্তুজাল? কখনো গুটিপোকা, যে নিঃশব্দ এক চেষ্টায় নিজেরই চারধারে বুনে নেয় ভাবনার রেশমি অন্ধকার? নাকি সে ভাবনার আলো, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকেন কবি স্কাইলার্ক পাখির মতো? শুধু কবিতাতেই নয়, তার গদ্য লেখাতেও শেলি নিয়ে আসেন কবির নিত্য নতুন তুলনা। কখনো তাকে মনে হয় নাইটিঙগেল, অন্ধকারের মধ্যে থেকেও যে শুধু গান দিয়ে নিজের নিঃসঙ্গতার লাঘব করতে চায়। কখনো মনে হয় কবিরা বুঝি বহুরূপীর জাত, তাদের পরিপার্শ্বের রঙ লাগে তাদের গায়ে। আবার কখনো উপমার আধারে একাত্ম হয়ে যায় কবি ও কবিতা। যা ছিলো কবিতার প্রতীক, সেই বীণা হয়ে ওঠেন কবি নিজেই, কোন ঐশী প্রেরণার বাতাস এসে তাঁকে বাজায়, করে তোলে অমর অক্ষর বাণীর যন্ত্র । বস্তুত শেলির এই সমস্ত উপমাই কি শেষ পর্যন্ত প্রতীকী অর্থে দ্যুতিময় হয়ে ওঠে না ? কবি ও কবিতা

নিয়ে তার চিন্তাভাবনার অনেকটাই ধরতে পারি এই সব উপমার একটু গভীরে যাবার চেষ্টা করলে।

কবিতাকে ব্রত করে নিয়েছেন এমন কবিকে কখনো না কখনো মুখোমুখি হতে হয় কিছু প্রশ্নের। কবি কাকে বলবো? কবিতাই বা কী? মানুষের জীবনে বা মানুষের সমাজে তার স্থান কতোখানি? শুধু কবিতা পাঠেন নন্দন ছাড়াও কি কবিতার আর কোন দায় আছে? আছে কোন পরম মূল্য ? এইসব বড়ো বড়ো প্রশ্ন নিয়েও যেমন কবিকে ভাবতে হয়, তেমনি নিজের হৃদয়ের কাছে চলে এসে সৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়েও ভাবেন তিনি। কী ভাবে লেখা হয় কবিতা ও কবিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া কি অন্য লেখালেখির চেয়ে ভিন্ন চরিত্রের? তার ভাষায় জাতও কি একেবারে আলাদা ? চিত্রকলা, ভাস্কর্য বা সঙ্গীতের মতো অন্য শিল্পের সঙ্গে কবিতার সম্পর্কই বা কেমন? আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে নয়, আত্মজ্ঞানের জন্যেই যে কোন সৎ কবিকে খুঁজতে হয় এইসব প্রশ্নের উত্তর। কাব্যতত্ত্ব কবির সৌখিন বিলাস নয়, এ তাঁর অস্তিত্বের গুঢ় সুত্র। তাই বুঝি মৃত্যুর এক বছর আগে আঠারোশো একুশের ফেব্রুআরি—মার্চে শেলি যথাসম্ভব গুছিয়ে নিতে চেয়েছেন নিজের ধ্যানধারণাগুলোকে, লিখেছেন ‘এ ডিফেনস অভ পোয়েট্রি।’ তবে এ গদ্য প্রবন্ধ না পেলে যে তার কাব্যতত্ত্ব আমাদের অজানা থাকতো তা নয়। তাঁর সারা জীবনের ছোট-বড়ো কবিতায় বারবারই এসেছে কবির কথা, কবিতার কথা, কখনো সরাসরি, কখনো বা পাতলা ছদ্মাবরণের আড়ালে। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মধ্যে আর কেউই কবিতা নিয়ে তার মতো ভাবিত ছিলেন না, কবিতা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বড়ো দাবীও করেননি কেউ।

অথচ শেলি কোন নতুন কাব্যতত্ত্বের উদ্ভাবক নন। তার ভাবনার ওপর তার যুগের চেতনার ছাপ স্পষ্ট। অগ্রজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত ভূমিকা (‘লিরিকাল ব্যালাডসে’র দ্বিতীয় সংস্করণে) ছায়া ‘এ ডিফেনস অভ পোয়েট্রি'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এতোটা প্রত্যক্ষ না হলেও কোলরিজের কবিতা-ভাবনার কিছু দূরস্মৃতিও হয়তো রয়েছে শেলির লেখায়। সাধারণভাবে য়ুরোপীয় নন্দনঐতিহ্য ও বিশেষ করে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে শেলির মতামতকে মোটেই বৈপ্লবিক

মনে হবে না। বিচিত্র সব উৎস থেকে শেলি ধার করেছেন অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ধারণা, পেয়েছেন অনেক সসত্ত্ব ইঙ্গিত। লেখার সময় আর একজন প্রাচীন পূর্বসুরী স্যর ফিলিপ সিডনির 'অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি'র প্রভাবও তার মনে কাজ করছিলো। সিডনির তোলা কিছু পুরোনো প্রশ্নেরই আবার নতুন করে উত্তর দিতে চাইছিলেন শেলি। আরো নিবিড় করে তার মনকে ঘিরেছিলেন প্লেটো । 'ডিফেনস' লেখার অল্প কিছুকাল আগেই প্লেটোর অন্তত দুটি কথোপকথন, 'ইঅন' ও 'সিমপোসিয়াম' ইংরিজিতে অনুবাদ করেছিলেন শেলি। প্লেটোর ভাববাদী দর্শন নিষিক্ত করেছিলো তাঁর চেতনাকে। বিচিত্র উৎস থেকে পাওয়া ধ্যানধারণার সর্বাংশে সুসমঞ্জস আত্মীকরণ হয়তো হয়নি। তবে কোন নিশ্ছিদ্র, বিশ্লেষণসহ সুসম্বদ্ধ তত্ত্বের জন্যে তো আমরা শেলির কাছে যাই না। তাঁর কাছে পাই কবিতা নিয়ে একটা উদ্দাম উৎসাহ। কবিতাকে শেলি দেখেছেন মানুষের অস্তিত্বেরই কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে, তার ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবন উভয়েরই পরিপূর্ণতার অভ্রান্ত উপায় হিসেবে। আবার এই দুই আয়তন ছাড়িয়ে যে পারমার্থিক জীবন তার সঙ্গে পার্থিব জীবনের সংযোগের সেতু হলো কবিতা। কবিতার মধ্যে দিয়েই অনন্তের আলো আসে। তাই মানুষের সব সৃষ্টির ওপরে তার স্থান।

কবিতার উদ্ভব নিয়ে শেলির ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে রেনেশাঁস ও রেনেশাঁস-উত্তর প্রচলিত ভাবনার অনুগামী। তবু তার মধ্যেও শেলি যেমনভাবে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনকে এক করে জীবন ও শিল্পের মধ্যে একটা সামগ্রিক সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেছেন তা লক্ষ্য করার মতো। শিশু তার ভালোলাগা কোন প্রাকৃতিক শব্দ বা ছন্দকে ধরতে চায় তার কণ্ঠস্বর বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। মূল প্রাকৃতিক উৎস থেকে গেলেও তার প্রতিধ্বনি থেকে যায় শিশুর প্রচেষ্টায়। পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ সমাজবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক সমবেদনাগুলো, সমাজের মধ্যের ঐক্য, বৈপরীত্য, বৈচিত্র্য তার আবেগের উৎস হয়ে ওঠে, তাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু এই সব ধরনের বস্তু বা ধারণার প্রতিমা সৃষ্টিতে মানুষের নিজের দেখা-বোঝার রীতি, তার অনুভূতিও বড়ো নিয়ামক। তাই অনুকরণ হয়ে ওঠে সৃষ্টি। মানুষের সৃষ্টির সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তার ভেতরের স্পন্দন বা ছাঁদ। সুন্দরকে শিল্পের মধ্যে ধরার চেষ্টাতেই

এই ছাঁদের জন্ম। শিল্প সৃষ্টির মূলে যে ভালোলাগা বা আনন্দ আর সেই আনন্দের আসল কারণ এই দুইয়ের মধ্যের সম্পর্ককেই বলি সুন্দর। ব্যাপক অর্থে কবি তিনিই যিনি তার শিল্পের স্পন্দন বা ছাঁদের মধ্যে এই সুন্দরকে প্রকাশ করতে পারেন। শুধু কবিরই ক্ষমতা আছে, সুন্দরের সবচেয়ে কাছাকাছি আসার। তিনিই পারেন কোন প্রাকৃতিক বা সামাজিক বস্তু বা ঘটনার ভেতরে অক্ষয় ও শাশ্বত সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে ও প্রকাশ করতে। যদি তাই হয় তবে শুধু ভাষার শিল্পেই নয়, যারা সঙ্গীত বা নৃত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা চিত্রকলার মধ্যে এই শাশ্বতের ছন্দকে ধরতে পারেন তাঁরাও কবি। আবার মানুষের সমাজজীবনের মধ্যে যে সনাতন সত্যের প্রকাশ আছে তাকে যাঁরা স্পর্শ করেছেন, তার ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যেতের মঙ্গলের জন্যে মান্য রীতিনীতি তৈরি করে দিতে পারেন তাঁরাও একই প্রতিভায় উজ্জ্বল। অদৃশ্য জগতের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করে যারা মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ভিত গড়েছেন সেই সব ক্রান্তদর্শীরাও তাদের ক্ষমতা ও প্রতিভায় কবিদেরই সগোত্র। শুধু কাল, দেশ ও জাতির বৈশিষ্ট্য ভেদেই তাদের কখনো বলি কবি, কখনো নবী, কখনো বা বিধানদাতা। যা এঁদের সামান্য গুণ তা হলো আপাতের আড়াল সরিয়ে প্রকৃতকে, সাময়িকের ভেতরে শাশ্বতকে জানার ও প্রকাশের ক্ষমতা। পরিচিত সব বাহ্যরূপের ভেতরে যে আদি ও অনন্ত ভাবরূপ আছে তার প্রতিচ্ছবি রচনাই হলো কবিকৃতি। এই পর্যন্ত শেলি স্পষ্টতই প্লেটোর অনুগামী। কিন্তু এখানে এসেই শেলির ভাবনা একটা সূক্ষ্ম মোড় নিয়েছে, প্লেটোকে ছাড়িয়ে প্লটিনাসের একেশ্বরবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকেছে। পৃথিবীর বিচিত্র রূপভেদের আড়ালে রয়েছে এক অজড়, অক্ষয় রূপ, তিনি অনন্ত, অসীম, একমেবোদ্বিতীয়ম। কবি সেই রূপাতীতের অংশী, তাঁর প্রকাশের মাধ্যম বা কাজকর্মের ক্ষেত্র যাই হোক না কেন—"A poet participates in the eternal, the infinite and the one." সেই অবিনশ্বর, অব্যয় ও অপরিবর্তনীয়ের প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়ে মানুষের যে সমস্ত ক্রিয়াকর্মে তা সবই ব্যাপক অর্থে কবিতা।

তাই কবিতার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক বোঝাতে শেলি ব্যবহার করেন মুকুরের উপমা যেটা রেনেশাঁসের সময় থেকেই য়ুরোপীয় সমালোচনায় প্রতিষ্ঠিত। সিডনির প্রতিধ্বনি

করে শেলি বলেছেন কবিতা এক আশ্চর্য মুকুর, যা এমনকি কুৎসিতের প্রতিচ্ছবিকেও সুন্দর করে তোলে। কেমন করে ঘটে এই রূপান্তর? শেলির ব্যাখ্যা অনেকটাই নিজস্ব। বাহ্য ও সাময়িক বস্তু-ঘটনা-তথ্যের আয়না শুধু আড়াল করে, ঝাপসা করে দেয়, এমনকি বিকৃতও করে। সময় তাকে মলিন করে, তার সৌন্দর্য হরণ করে নেয়। কিন্তু কবিতা বাহ্য আবরণ সরিয়ে ভেতরের সত্য প্রকাশ করে বলেই সে মুকুরে সবই সুন্দর। তাই আপাতদৃষ্টিতে বিকৃত জিনিসও কবিতায় সুন্দর। সে সৌন্দর্য চিরকালেরও বটে। আবরণ সরিয়ে সত্য ও শাশ্বতকে দেখা শেলির কবিতা ভাবনার গোড়ার কথা বলেই হয়তো তাঁর নিজের কবিতায় অবগুণ্ঠনের চিত্রকল্প এতো অবিরত। অ্যালাসটরের বিষন্ন কবি একবার যে অবগুণ্ঠনবতীকে দেখে তারই সন্ধানে যায় তার বাকি জীবন। এপিসিকিডিনেও কবি খুঁজেছেন এক 'Veild Divinity-কে। ইপ্সিত সৌন্দর্যকে আবিষ্কারের মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারেন-

I knew it was the vision veiled from me

So many years.

এ-অবগুণ্ঠন প্রায়শই অতি-পরিচয়ের ঘন পর্দা যা দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে। কবিতা এই পর্দাকেই ছিঁড়ে ফেলে এবং ‘lays bare the naked and sleeping beauty, which is the spirit of its forms", এই spirit শব্দটাই শেলির লেখায় এতো ঘন ঘন ফিরে আসে কেন? বাইরের খোলসটাকে ভেদ করে একেবারে অন্তঃস্থলে পৌঁছোনোর ইচ্ছেটাই কি তার কারণ নয় ? এমনকি সুন্দরকেও তিনি শুধু beauty বলে তৃপ্ত হন না বড়ো একটা। কীটসের কাছে সুন্দর একটা স্বয়ম্ভর ধারণা, এতোটাই যে, তাকে বড়ো হাতের আদ্যক্ষর দিয়ে মূর্ত করে ফেলেন—‘Beauty’. শেলি কিন্তু তাকে হয় বিশেষিত করে নেন, Ideal Beauty, Intellectual Beauty, নয়তো চলে যেতে চান তারও গভীরে, খোঁজেন ‘The spirit of beauty.’

শেলির এই সব কাব্য-ভাবনা একটু নিবিড় করে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায় যা শেলী সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণাকে সমর্থন নাও করতে পারে। প্রথমত, কবিতা রচনা শেলির কাছে কোন সৌখিন বিলাস নয়, কবিতা

মানুষের জীবনের আদ্য প্রেরণা। কবিতার শিল্প আর জীবনের শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি শেলি। মানুষের সমস্ত জীবনটাই কবিতার পটভূমি। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্য-ঘটনা-বস্তু যেমন কবিতার উৎস হতে পারে তেমনি সমাজবদ্ধ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও কবিতার আকর। দৃশ্য বাস্তব জগতও কবিতার বিষয়, আবার মানুষের অদৃশ্য চিন্তার জগতও কবিতার অন্তর্গত। শেলির কবি কখনো সমাজ-পালানো আপন-ভোলা নন; একা একা বসে বসে বাঁশি বাজানো কোন পলাতক তার কাছে কবির মর্যাদা পেতেন না তা নিশ্চিত বলা যায়। ওঅর্ডসওঅর্থের মতো শেলিও বারবার বলছেন কবি মানুষেরই একজন। শুধু তার সংবেদনশীলতায় এবং মানুষের প্রতি তার দায়িত্ববোধেই তিনি নিঃসঙ্গ, যন্ত্রণা-দীর্ণ। তাই কখনো তাঁকে হতে হয় বটে নির্জন মিনার-বাসী, প্রিন্স এথানাসের মতো। কিন্তু 'lonely tower' কবির নিঃসঙ্গ সন্ধানের প্রতীক। ডব্লিউ বি. য়েটস্ ঠিকই বুঝেছিলেন, শেলির কবিতায় মিনার হল 'the mind looking outward upon men and things'-এর চিত্রকল্প। পরবর্তীকালে যদি তা গজদন্তমিনার হয়ে ওঠে, তার দায়িত্ব শেলির নয়।

দ্বিতীয়ত, শেলির কবিতা-ভাবনা বিরাট পরিসরে বলে তার চোখে কবি ও নবীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়কে নিয়ে কবির কারবার, তাই বর্তমানের যে ছবি তিনি আঁকেন তা আদর্শের ছবি, বর্তমান ঠিক যেমন হওয়া উচিত তারই প্রতিলিপি। ভবিষ্যতেও তার কোন পরিবর্তন হবার নয়। ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে কবির লেখা থেকেই, সেখানেই আছে ভবিষ্যতের অঙ্কুর। সে অর্থে কবিও ভবিষ্যদবেত্তা, নবীদের মতো আক্ষরিক আর্থে নয়, কিন্তু গূঢ় অর্থে।

তৃতীয়ত, এ-রকম কাব্যতত্ত্বে বিভিন্ন ধরনের কবিতার মধ্যে বা বিভিন্ন যুগের কবিতার স্বাতন্ত্রকে অস্বীকার হরা হয়। যে কোন সময়েই যা চিরন্তন সত্য শুধু সেটুকু ধরাই যদি কবিতার উদ্দেশ্য হয় তবে সময়ের নিজ প্রতিভা কবিতায় ফুটে ওঠার অবকাশ কই? তাছাড়া সব কবিতা বিচারের মানদণ্ডও কি একরকম হয়ে উঠবে না? 'এ ডিফেন্স অভ পোয়ট্রি'তে য়ুরোপীয় কবিতার যে দ্রুত-ইতিহাস শেলি দিয়েছেন তাতে বিভিন্ন যুগের কবিতায় কালের প্রভাবকে বোঝার চেষ্টা করা হয় নি, শুধু চিরকালীন সত্য কতোটা

অবিকৃত বা তির্যক প্রকাশিত হয়েছে তাই বিচার করা হয়েছে অনুপুঙ্খ সাহিত্য-সমালোচনা বলতে আমরা যা বুঝি এ প্রবন্ধে তা বিশেষ পাই না। পাই উঁচু সুরে বাঁধা কাব্য-আদর্শের উচ্ছাস। শেলির কবিতা-ভাবনার সবটুকু জোর পড়েছে বিষয়ের ওপর; কবিতার আঙ্গিকের বিচারে তিনি উদাসীন। যখন প্রচলিত অর্থে কবিতার কথা বলেন তখনও তিনি প্লেটো বা বেকনের মতো গদ্য লেখকদেরও কবির মর্যাদা দেন। তাই কবিতার আঙ্গিক নিয়ে বা কবিতা ও গদ্যের ভেদাভেদ নিয়ে তাকে কোন নতুন কথা বলতে শুনি না। 'ডিফেনস' লেখার কয়েক বছর আগে প্রকাশিত বায়োগ্রাফিআ লিটেরারিআ'র কোলরিজ যে অন্তদৃষ্টি দিয়ে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করেছিলেন তার পরেও শেলির এ-উদাসীনতা আমাদের কিছুটা বিস্মিত করে নিশ্চয়ই। কবিতার বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েও ওঅর্ডসওঅর্থ কিন্তু আঙ্গিক নিয়ে অনেক বৈপ্লবিক কথা বলতে পেরেছিলেন।

কবিতা-ভাবনার এইসব অনুপলব্ধ দিকগুলোর যথেষ্ট ক্ষতিপুরণ অবশ্য হয়ে যায় কবিতার নৈতিক আবেদনের রীতি-প্রকৃতি নিয়ে শেলির চিন্তা-ভাবনায় এবং কবিতার পরম মূল্য নিয়ে তার উচ্ছ্বসিত দাবীতে। শেলির কাছে কবিতা যেন একটা ঐশী প্রজ্ঞা। যাঁদের মাধ্যমে তার প্রকাশ হয় সেই কবিরাও কি সবসময় বোঝেন তার রীতিনীতি? তাই কোন বড়ো কবিও 'এখন কবিতা লিখবো' বলে কবিতা শুরু করতে পারেন না। তাকে অপেক্ষা করতে হয় সঠিক মুহূর্তের জন্যে, নিজেকে করে তুলতে হয় বীণার মতো যাকে বাজিয়ে যাবে ঐশী প্রেরণার অদৃশ্য বাতাস। যখন কবির চিত্তকে উতরোল করে এই দমকা বাতাস জাগিয়ে তোলে তাঁর ভেতরের ক্ষমতা তখন তিনি যে অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু তা তার সচেতন প্রচেষ্টা বা শাসনের বশ নয়, সে অভিজ্ঞতাকে যদি ধরে রাখা যেতো তবে কী কবিতাই না আমরা পেতাম! বাস্তবে যে কবিতা আমরা পাই তা কবির অভিজ্ঞতার দীন প্রতিচ্ছায়া মাত্র। যখন কবি লিখতে শুরু করেন তখন তাঁর মন অনেকটা নিভে আসা কয়লার মতো শুধু দু'একটি ক্ষণস্থায়ী ঝলকমাত্র দেখি তাতে।

তবু যেটুকুই হোক এই কবিতাই পারে ঐ পলাতকা বেপথু অভিজ্ঞতা ধরে রাখতে। মানুষের সত্তার মধ্যে নিবিড় হয়ে আছে যে ঐশী সত্তা তার সামান্য আভাস পাই কবিতাতেই, অন্যথায় তা অবিরত মুছে যায়, লুপ্ত হয়ে যায়। শেলির চোখে কবিতা সুন্দর ও শুভকে অনশ্বর করে রাখার প্রকৃষ্ট উপায়। যে সব আলো মানুষের জীবনে জ্বলে ওঠে, জ্বলে আর নিভে যায়, তাদের ধরে রাখতে চায় কবিতা, চিত্রকল্প-সিদ্ধ শেলি অবিনশ্বর করে বলেছেন-

--"Poetry redeems from decay the visitations of the divinity in man." এমনভাবে দেখলে শুধু কবিই নবী হয়ে ওঠেন না, কবিতাও হয়ে ওঠে মানুষের সকল প্রজ্ঞার আধার, সব রকম জ্ঞান ও বিদ্যার পরাকাষ্ঠা। কবিতা সম্পর্কে এমন দাবী করেছিলেন ওঅর্ডসওঅর্থও। শেলি তাকে নিয়ে গেছেন আরো উত্তুঙ্গ স্তরে। কবিতাই মানুষের সব জ্ঞানের উৎস, আবার সব জ্ঞানেরই ভেতরের সজীবতা। কবিতাই জ্ঞানের ফুল ফল ও বীজ। অর্থাৎ কবিতার স্পর্শ না থাকলে জ্ঞান থাকে শুকনো বোঝা হয়ে, নতুনতর জ্ঞানের উদ্ভবও যায় স্তব্ধ হয়ে। অন্য অনেক রোমান্টিকদের মতো শেলিও কবিতার জ্ঞানকে দেখেছেন মানুষের কেজো জ্ঞান ও পাটোয়ারি বুদ্ধির বিরোধী হিসেবে। তারপর এক অভিনব উপায়ে তার আদর্শবাদী কাব্যতত্ত্বকে মিশিয়ে দিয়েছেন তার বাস্তববোধ ও সমাজচেতনার সঙ্গে। যুক্তি তর্ক নির্ভর জ্ঞান আর টিপে টিপে পা ফেলার পাটোয়ারি বুদ্ধি আমাদের কতোদূর নিয়ে যেতে পারে? বিজ্ঞান আর অর্থনীতির জ্ঞান যদি যথেষ্ট হতো তবে বিজ্ঞান-সৃষ্ট ধনের বণ্টনে এতো বৈষম্য কেন ? নৈতিক-রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক জ্ঞান তো আমাদের বেড়েছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগে এতো অপারগতা কেন? কেনই বা সমাজে এতো বৈষম্য, অনাচার ? শেলির মনে হয়েছে এই সব জ্ঞানের মধ্যে যা কিছু শাশ্বত ও অবিনশ্বর অর্থাৎ তার মধ্যে যা কিছু কবিতা, ঢাকা পড়েছে। তাই শুধু তথ্যের জঞ্জাল বেড়েছে, অতিহিসেবি বুদ্ধি প্রবল হয়েছে। কবিতার সৃজনী ছোঁয়া নেই বলেই বিজ্ঞান বাহ্য জগতের ওপর মানুষের অধিকার যতো বাড়িয়েছে, মনোজগতকে সঙ্কুচিত করেছে ততোটাই। বিজ্ঞানের অপব্যবহার আর মানুষের সমাজের যতো অসাম্য এ সবই কি কবিতার স্পর্শের অভাবেই নয়? শেলি

তাই কবিতাকে দেখেন অশুভের বিপরীত মেরু হিসেবে, অসুরের বিপরীতে যেমন সুরদেবতা। মানুষের দুঃসময়ে, যখন অহংবৃত্তি প্রবল আকার নেয়, হিসেবী বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, মনের ঐশ্বর্য বিলীন হয় বাহ্য আড়ম্বরে, তখনই কবিতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু কেমন করে সে প্রয়োজন মেটাবে কবিতা ? কবিতার কি কোন উপযোগিতা আছে, কোন নৈতিক আবেদন? কীভাবেই বা তা কাজ করে মানুষের মনে ? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শেলি পৌঁছেছেন তার আদর্শবাদী কাব্যভাবনার উত্তুঙ্গতম বিন্দুতে। হয়তো কিছুটা বায়বীয় তাঁর উচ্ছ্বাস। তবু কবিতার উপযোগিতার প্রশ্নে শেলি-পূর্ববর্তী ইংরেজ সমালোচকদের অগভীর চিন্তা আর তার পরবর্তীকালে কলাকৈবল্যবাদীদের সরলীকৃত সমাধানের পরিপ্রেক্ষিতে তা যথেষ্ট সূক্ষ্ম মনে হয়।

নীতিবাদী কবিতা ছিলো শেলির চক্ষুশূল। 'প্রমিথিউস আনবাউনডে' র ভূমিকায় বলেছেন সে কথা, 'ডিফেনস অভ পোয়েট্রি' তে বলেছেন আরো বিশদ করে, আরো সুন্দর করে। কবি কেন কোন নীতি প্রচারের কাজে নামবেন, কেন কল্পিত সুনীতির লক্ষ্যে কবিতাকে কাজে লাগাবেন? যে কোন কবির ভালোমন্দ বোধ তাঁর কাল ও দেশের অধীন কিন্তু কবিতা তো এমনিভাবে দেশ-কাল বন্ধ নয়। হোমারের গ্রীস নৈতিকতার দিক থেকে কলুষমুক্ত ছিলো না নিশ্চয়ই, অনেক আদিমতা, বর্বরতা ছিলো। তবু তার সৃষ্ট চরিত্র মানুষকে উদ্‌বোধিত করেছে। ছোটখাটো ত্রুটি হচ্ছে একটা অস্থায়ী, স্বচ্ছ আবরণ যার মধ্যে দিয়ে কবি দেখেন চিরন্তন সত্যকে। এ আবরণ ভেতরের সৌন্দর্যকে আড়াল করে না, বরং স্বচ্ছ আচ্ছাদনের জন্যেই সত্যকে আরো গভীর করে অনুভব করি। এটা ভুলে গিয়ে কবি যখন নীতিবাগীশ হতে যান তখন তাঁর নিজের সময়ের নীতিবোধে বাঁধা পড়েন, কবিতায় সত্য ও সুন্দরের ভাগ ততোটাই কমে যায়। প্রকৃতপক্ষে নীতিশাস্ত্র ও কবিতার সম্পর্ক নিয়ে কাব্যতাত্ত্বিকদের এতোদিনের অনুমিতিকে শেলি একেবারে বৈপ্লবিকভাবে উল্টে নিয়েছেন। নীতিশাস্ত্র কবিতার পূর্ববর্তী নয়, বরং কবিতায় যে ধারণাগুলোর সৃষ্টি হয় সেগুলোকেই গুছিয়ে নিয়ে সূত্র ও দৃষ্টান্ত দিয়ে তৈরি হয় নৈতিকতার আদর্শ। শেলির কাছে কবিতাই সব ধারণা সব ক্ষমতা ও মূল্যবোধের

উৎস। অর্থাৎ মানুষের ভাবনা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় কবিতাতেই। প্রাক্ রোমান্টিক কাব্যভাবনায় এ রকম চিন্তার অস্তিত্ব ছিলো না। তাদের কাছে ধর্ম, নীতি বা আইনই ধারণা ও মূল্যের সৃষ্টি করে। কবিতা বড়োজোর তাকে মনোরঞ্জক করে প্রচার করতে পারে। রোমান্টিকরাই কবিতার জন্যে একটা সর্বাত্মক স্বয়ম্ভর ক্ষমতার দাবী করলেন। তবু তারাও কেউ শেলির মতো এতো আপোষহীন, এতো উচ্চকিত দাবী করেন নি।

নীতিবিদ বা বিজ্ঞানী, সংস্কারক বা রাজনীতিক নিশ্চয়ই সমাজের উপকার করেন। মানুষের জীবন ও মনের অনেক উন্নতি তাদেরই দান। তাদের যে উপযোগিতা তাকে শেলি অস্বীকার করেননি। কিন্তু তা নিশ্চয়ই কেজো বাস্তবের উপযোগিতা। এও লক্ষ্য করি, তাদের অর্জিত জ্ঞান সত্ত্বেও মানুষের ঘৃণা, বিদ্বেষ, অত্যাচার, হানাহানির বৃত্তান্ত বন্ধ হয় নি, পৃথিবীর কলুষও দূর হয় নি। কবিতার উপযোগিতা একেবারে ভিন্ন জাতের, মানুষের মনে তার আবেদনের চরিত্রই আলাদা। কবিতা প্রয়োগ-যোগ্য বিদ্যা নয়, কিন্তু সকল প্রয়োগ যোগ্য জ্ঞানের শুরু যেখানে সেই অনুভূতি ও কল্পনার ওপরেই চলে কবিতার অদৃশ্য ক্রিয়া। কবিতা মনের প্রসার ঘটায় যাতে সহস্র নতুন চিন্তার প্রবাহ অবাধে প্রবেশ করতে পারে। মনে। পরিচয়ে দীর্ণ পৃথিবীর ওপর থেকে একটা পর্দা যেন সরে যায়। এতোদিন চোখে না পড়া অনেক কিছু নজরে আসে। সমবেদনা ও ভালোবাসার জন্ম হয় যা মানুষকে নিয়ে যায় নিজের বাইরে। এই ভালোবাসা ছাড়া কি কোন মানুষের পক্ষে পরের কাজে লাগা সম্ভব? তাই কল্পনার প্রসারতা ও গভীরতা আমাদের সব কাঙ্খিত আদর্শের পূর্বশর্ত। কবিতা এই কল্পনারই পরিধি বাড়িয়ে দেয়, কাজ করে আদি বিন্দুতে। প্রয়োগযোগ্য জ্ঞানের চর্চা যদি হয় ফলশ্রুতি তবে কবিতা তার আদি কারণ। সে অর্থে কবিতার উপযোগিতা অপরিমেয়।

কবিতা ও জীবনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অথবা কবিতার শৈল্পিক ও শিল্প-অতিরিক্ত বিবেচনার মধ্যে শেলি যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রাখতে পেয়েছিলেন তা কি দীর্ঘকাল বজায় থাকা সম্ভব ছিলো? যদিও রোমান্টিক নন্দনের মূল পালায় শিল্প ও জীবন পরস্পর-সম্পৃক্ত পরস্পর- নির্ভর এরং শেলিও সেই ধারারই উজ্জ্বল প্রবক্তা, তবু তার ভাবনায় বিষয়টি যে মোড় নিয়েছে তাতে আদর্শের উদ্ভাস যতোটা আছে, যুক্তিসহতা ততোটা

নয়। তার অনুজ কবি কীটসে এসেই দেখি রোমান্টিক কবিতা-ভাবনার ভারসাম্য কেমন যেন টলে গিয়েছে। শেলির কাছে কবিতা মানুষের সৃষ্টি, সবচেয়ে শ্লাঘনীয় নিদর্শন, কবি সমাজের মাধ্যমণি। কবিতা আর দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি শেলি। অর্থাৎ কবিতা আছে মানুষের অস্তিত্ব, তার সমস্ত সভ্যতাকে ব্যেপে। অর্থাৎ শৈল্পিক আবেদন ছাড়াও কবিতার কিছু নৈতিক সামাজিক ফলশ্রুতি আছে, সেখানেই কবিতার পরম মূল্য। কীটস এমন কোন পরম মূল্য সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে পারেন নি, যদিও তাকে মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েছেন বেশ কয়েক জায়গায়। হয়তো নিজের অনুভূতি ও প্রতিভার চরিত্রের বিরুদ্ধাচারণ করেও চেষ্টা করেছেন। তেমন প্রত্যয়ের দিকে এগোতে। এই দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্বই কীটসের কবিতা-ভাবনার সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক। তাই দেখি দর্শন ও কবিতার সম্পর্ক নিয়ে তার মতামতে বরাবরই এটা অস্বাচ্ছন্দ্য রয়ে গেছে। 'দর্শনের শীতল স্পর্শে কবিতার মায়া দূরে চলে যায়,' এমন ধারণা নিয়ে যাঁর কাব্য প্রয়াসের শুরু, পরবর্তীকালে সচেতনভাবে কবিতা থেকে দার্শনিক সত্য নিষ্কাশিত করে নেবার চেষ্টাতেও তার সে-অস্থিরতা দূর হয় নি। বরং এ-বিষয়ে তার দোলাচল ও অন্তর্দ্বন্দ্বই রোমান্টিক নন্দনের সুস্থিত ও সহজ প্রত্যয় ধসে যাবার প্রাক্-মুহূর্তকে চিহ্নিত করেছে।

স্বরচিত কবিতায় কবি ও কবিতা নিয়ে কিছু উল্লেখ আর চিঠিপত্র করা চটজলদি কিছু মন্তব্যের ওপর নির্ভর করে কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্যতত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা অনুচিত। তাছাড়া অকালমৃত্যুর আকস্মিক পূর্ণচ্ছেদে মণ্ডিত কীটসের জীবনে ও মতামতে সুস্থিরতা ও পরিপূর্ণতা আশা করা চলে না। তবু এইসব মতামতই পরবর্তীকালে ইংরিজি কবিতার নান্দনিক চিন্তার নিরিখে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। শিল্পকে জীবন থেকে বিচ্যুত করে নিয়ে যে কলাকৈবল্যবাদ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিলো তা কেন কীটসকেই তার অন্যতম প্রেরণা বলে ভাববে তাও বোঝা দরকার। আসলে কলাকৈবল্যবাদের অন্তত দুটি মূল ঝোঁকের আভাস কি কিটসেই প্রথম পাই না ? এক, কবিতার মূল্য তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কবিতা অন্যান্য শিল্পের মতোই স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভর এবং পাঠকের চিন্তা-ভাবনা, নীতিবোধ বা এককথায় জীবনযাপনের ওপর তার কোন প্রতিক্রিয়া থাকা অপ্রাসঙ্গিক। দুই, যেহেতু কবিতার কোন বাহ্য দায় থাকছে না; তাই কবির অভিজ্ঞতাই

তার অনন্য লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। সেই অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তা, তীব্রতা ও উচ্ছাসই কবির একমাত্র ঈপ্সিত।

সারা জীবন ধরে যে সৌন্দর্যের উপাসনা কীটস করেছেন অবিচল একাগ্রতায় তাকেই বলতে পারি তার কবিতার আদি প্রেরণা ও অন্তিম আদর্শ। কবি-প্রতিভা উন্মেষের প্রথম লগ্ন থেকে স্বল্পায়ু জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই ধ্রুব লক্ষ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। তার সমস্ত অন্বেষণ, দেশ কালের মধ্যে তার সব মানসযাত্রার পেছনে আছে তারই অদৃশ্য আকর্ষণ। বড়ো হাতের হরফে লেখা কোন বিমূর্ত ধারণা সে নয়, Beauty তার কবিতা-জগতেরই ঈশ্বরী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর উপাসনায় তন্নিষ্ঠ কবি কি জীবন ও জগতের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটকে অনেকটাই উপেক্ষা করলেন না? কবি যদি একান্তভাবে সুন্দরের অভিসারী হয়ে ওঠেন তবে জীবন ও কবিতার মধ্যে বাঁধনগুলো কি আলগা হয়ে যেতে থাকে না? যে কবিতার সঞ্চারণ ক্ষেত্র ছিলো আবিশ্ব, যে পটভূমি ছিলো মানুষের জীবনের সমস্ত সম্ভাব্য

তাৎপর্য ঘিরে তাও ছোট হয়ে আসে একটা শিল্পিত আয়তনের মধ্যে। কবিতার প্রতি কবির বিশ্বস্ততা আর জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততার সমার্থক থাকে না যেমনটা ছিলো শেলির ভাবনায় । কীটস এই অন্তর্বিরোধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই বারবার কবিতাকে মানুষের দুঃখ শোকের মুখোমুখি নিয়ে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। যে কবি শুধুই স্বপ্ন দেখেন তিনি যে যথেষ্ট বড়ো কবি নন, সেকথা তার জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ‘স্লীপ এ্যাণ্ড পোয়ট্রিতেই তার মনে হয়েছিলো। পরে ‘দ্য ফল অভ হাইপেরিঅন’-এ সাধিকা মোনেটার কথায় এ পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়েছে। স্বপ্নদ্রষ্টা ও কবির কাজে মিলের চেয়ে অমিলই বেশী-

The one pours out a balm upon the world,

The other vexes it.

শনিদেবতার মন্দিরে আগন্তুক দুর্বল সাহায্য-প্রত্যাশী যে কবির ছবি আছে তাই প্রমাণ করে কীটস কবির ভূমিকা নিয়ে শেলির নির্দ্বিধ আদর্শে আস্থা রাখতে পারেন নি। কবির

স্থান কর্মবীরের ওপরে, শেলির এ প্রত্যয়ও তার ছিলো না। কীটসের নিজের মানসিকতা ছিলো স্বপ্নদ্রষ্টার দিকেই। তাই দায়িত্বশীল জীবনমুখী কবিতা লেখাটা তার জীবনে অভিলাষই থেকে গিয়েছে।

কবিতার বাইরে তার কোন পরম মূল্য ও উপযোগিতা নিয়ে কীটসের মতামতেও সমান স্ববিরোধ লক্ষ্য করি। বিধিবদ্ধভাবে যে মত তিনি দিয়েছেন তা রোমান্টিক নন্দনের মূল ধারারই প্রতিধ্বনি।

Sure not all

Those meiodies sung into the world's ear

Are useless, sure a poet is a sage:

A humanist, physian to all men.

কিন্তু চিঠিপত্রে, ব্যক্তিগত মতামতে লক্ষ্য করি ভিন্ন এক টান। ওঅর্ডসওঅর্থের কবিতা লেখার পেছনে একটা সহজগ্রাহ্য উদ্দেশ্যের উপস্থিতি তার ভালো লাগে নি। ভালো-মন্দ নিয়ে কবির মাথা ব্যথার কোন কারণ দেখেন নি তিনি। শেলির মন্তব্যের প্রতিবাদ করে তাঁকে লিখেছিলেন—যদি কবিতার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর তবে শিল্পীর পক্ষে অসুরের সাধনাই ভালো। কেউ কেউ বলেছেন, কবিতার কোন বাহ্য উপযোগিতা থাকার ব্যাপারে কীটসের আপত্তি ছিলো না, আপত্তি ছিলো শুধু কবিতাকে সরাসরি বাণী প্রকাশের কাজে লাগানোর বিরুদ্ধে। এর উত্তরে বলতে হয় কবিতার সুপ্ত বাণী কীভাবে পাঠকের মনে কাজ করবে। তা নিয়ে কীটসকে কোন ভাবনাচিন্তা করতে দেখি না, যেমনটা দেখেছি শেলির ক্ষেত্রে।

এই রকম অনেক স্ববিরোধের মধ্যে দিয়েই কটিস একটা সৌন্দর্যতত্ত্বের দিকে এগোতে চাইছিলেন। কবিতার সঙ্গে দর্শনের কোন সম্পর্ক রাখতে চান নি একসময়। পরে তার সৌন্দর্য সাধনাকেই একটা বুদ্ধিনির্ভর দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদা দিতে চাইলেন। সুন্দর ও সত্যকে সমার্থক করে একটা সামান্যসূত্র তৈরি করতে তাঁর চেষ্টা পরবর্তী কবি-শিল্পী ও নান্দনিকদের যে পরিমাণ মনোযোগ পেয়েছে, তা হয়তো তারও অভাবিত ছিলো।

নন্দনতাত্ত্বিকেরা মোহিত হতে পারেন, এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারেন। কিন্তু সত্যিই কি কোন তত্ত্বের মর্যাদা পেতে পারে কটিসের এই ভাবনা? 'কল্পনা যা কিছুকে সুন্দর বলে মনে করে তা অবশ্যই সত্য,' এ উক্তির মধ্যে কবির স্পর্ধা যতোটা আছে প্রতীতি উৎপাদনের ক্ষমতা ততোটা নয়। 'ওড অন আ গ্রীসিআন আর্ন'-এর বিখ্যাততর শেষ লাইন দুটোও কোন ব্যতিক্রম নয়। 'Beauty is truth, truth beauty' সমীকরণের দুটি প্রান্তই সমান অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। উপরন্তু তা কবিতাটি থেকে অনিবার্যভাবে উঠে আসে না। কবিতার অভিজ্ঞতা পাঠককে মোহিত করলেও এই তত্ত্বের উপলব্ধি করাতে অক্ষম। এ ব্যাপারে ওঅর্ডসওঅর্থের কবিপ্রতিভার সঙ্গে কীটসের প্রতিভার একটা চরিত্রগত বৈপরীত্য আছে। কটিসের কল্পনা ইন্দ্রিয় নির্ভর, যেটুকু ভাবনা তার কবিতায় প্রবেশ করে তা নির্বস্তুক। ওঅর্ডসওঅর্থের কল্পনায় কিন্তু ভাবনা ইন্দ্রিয় চেতনার হাত ধরে চলে, তাই ভাবনার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না।

বরং শৈল্পিক অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তা ও তীব্রতা নিয়ে কীটসের মতামতগুলো রোমান্টিক কবিতা-ভাবনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। জগত ও জীবনের বড়ো বড়ো প্রশ্নগুলো নিয়ে কীটস ভাবিত ছিলেন না, শেলির মতো সামাজিক অসাম্য উৎপীড়ন নিয়ে তাঁকে একবারও কথা বলতে শুনি না। কিন্তু যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে সরাসরি স্পর্শ করে, যেমন শোক-জরা মৃত্যু তা তাকে রীতিমতো বিপন্ন করেছে। এগুলোকে ভুলতে অথবা এড়িয়ে যেতে শৈল্পিক অভিজ্ঞতাতেই মগ্ন হয়ে যাবার একটা প্রবণতা কীটসের ছিলো। স্বভাবিকভাবেই কীটসের মনোযোগ সবটুকু পড়েছে এই অভিজ্ঞতার ওপর। যতো তীব্র, প্রগাঢ় হতে পারে এই অভিজ্ঞতা ততোই তা শ্লাঘনীয় ক্ষণস্থায়ী। হলে কি হবে, অনুভূতির প্রগাঢ়তাই শৈল্পিক অভিজ্ঞতাকে প্রত্যায়িত করতে পারে। কীটসের অনেক কবিতার স্পষ্ট ঝোক হলো একটা উন্মাদনার অভিজ্ঞতা সৃষ্টির দিকে। ওগুলোতে তিনি বারবার সেই চেষ্টাই করেছে। তাই তাকে বলতে শুনি—'The excellence of every art is its intensity'. তাই সুন্দর ভাষা-চিত্রকল্পের প্রতি তার অনুরাগ ছিলো প্রেমিকের মতো। কবিতার মধ্যে তিনি চাইতেন একটা চমৎকার

আতিশয্য, সুন্দরের স্পর্শ পাঠককে শুধু উন্মুখই করবে না তাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেবে এটাই তিনি কাম্য মনে করেছেন। কবিতা গাছের পাতা গজানোর মতো স্বাভাবিক হোক, তার এ অভীপ্সাও কি আসলে শিল্পের অভিজ্ঞতাকে স্বয়ম্ভর, স্বয়ংসিদ্ধ করে তোলার, বাস্তবের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? এখান থেকে কলাকৈবল্যবাদের, ওঅলটর পেটারের 'Not the fruit of experience but experience itself is the end'-এর দূরত্ব নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়? রোমান্টিক কবিতা-ভাবনার জগতে কীটসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান তার। আত্মবিলোপী কল্পনা বা 'Negative capability'-র ধারণা। সমকালের প্রেক্ষাপটে তার। ধারণার স্বাতন্ত্র্য আমাদের আশ্চর্য করে, এখানেই কীটস স্বাধীন ও মৌলিক হয়ে উঠেছেন। কবির কল্পনা নিয়ে রোমান্টিকদের যে বিরাট দাবী ছিলো তাতে কীটসেরও সমান সায় ছিলো। অথচ এ বিশ্বাস থেকে তিনি পৌছেছেন তার সময়ের অন্য সব কবির থেকে একেবারে ভিন্ন ধারণায়। কীটসের কাছে ওঅর্ডসওঅর্থ ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক উদাত্ত কল্পনার প্রতিভু। ওঅর্ডসওঅর্থ থেকে শেলি পর্যন্ত সব ইংরেজ কবিকেই এই ধারারই অন্তর্গত বলে ভাবতে পারি। এ-কল্পনা আত্মসচেতন নিঃসঙ্গ শক্তি যা কবির অন্তরে আকর্ষণ করে বাহ্য প্রকৃতিকে। বাইরের পৃথিবীর যা কিছু অর্থ তা ঐ কবির চৈতন্যকে ঘিরেই। কীটসের আদর্শ কল্পনা একেবারে বিপরীত চরিত্রের। এ কল্পনা আত্মবিস্মৃত, অন্য জীব এমনকি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে ঠিক তাদেরই মতো করে ভাবা আর সেই ভাবনা প্রকাশ করার ক্ষমতাই এই কল্পনা। প্রথম ক্ষেত্রে কবির চেতনাই সর্বব্যাপী, দ্বিতীয়টিতে কবির নিজের অস্তিত্ব প্রায় অবলুপ্ত। কবির মানসপ্রক্রিয়ার যে ছবি কীটস এঁকেছেন তাও সে সময়ের অন্য কবিদের। আদর্শের থেকে আলাদা। ওঅর্ডসওঅর্থের কবি মানুষ হলেও তার ভূমিকা উদাত্ত, মানবপ্রকতির মধ্যে যা কিছু শাশ্বত ও সার্বজনীন তারই রক্ষক। কোলরিজের বর্ণনায় কবি সৃষ্টিতে বিশ্বস্রষ্টারই সগোত্র। শেলির কাছে কবি, এমনকি অবহেলিত হলেও সমাজ সভ্যতার আদি সূত্রধর। এদের সবার ধারণাতে কবিই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু, গুরুত্বে ও মহিমায় আত্মকেন্দ্রিক। সকলের মধ্যে থাকলেও তিনি স্বতন্ত্র। কীটসের আদর্শ কবি ঠিক এর বিপরীত। তার কোন প্রাতিস্বিকতা নেই, বিশেষভাবে কবি বলে চোখে পড়ার মতো

কোন পরিচয় নেই। বলতে গেলে কবিই সবচেয়ে অকবিসুলভ চরিত্র। নিজেকে বিস্মৃত হয়ে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে একাত্ম করে ফেলাতেই তার আনন্দ। তাই এক ঘর লোকের মধ্যে কবির নিজের অস্তিত্ব প্রায় মুছে যায়। অন্য সকলের চেতনা আলাদা করে অধিকার করে কবির মন। তাই জানলার পাশে চড়াই পাখি এলেই কবির মন তার সঙ্গে নেমে যায়, খুঁটে খুঁটে খেতে থাকে কতো কিছু। কখনো বৃষ্টির রাতে কীটসের মনে হয় যেন ডুবে যাচ্ছেন, তারপরে ধীরে ধীরে পচে উঠছেন একটা গমের দানার মতো। শেষ বিচারে কল্পনার এই দুটো সম্ভাব্য ভূমিকা বোধহয় পরস্পরের সম্পূরক। দুটো ভিন্ন দিক দিয়ে পৌঁছানো অভিন্ন লক্ষ্যে। আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মবিলোপী উভয় রূপেই কবির কল্পনার কাজ করার পদ্ধতিও কি এক নয়? কাব্যতত্ত্বের জগতে যিনি দার্শনিক সেই কোলরিজ যে প্রক্রিয়াকে বলেছিলেন বাহ্য জগত ও চৈতন্যের মধ্যে পারস্পরিক বিক্রিয়া এবং একের মধ্যে অন্যের সর্বাঙ্গীন বিগলন। তবু কীটসই পেরেছিলেন সে যুগের প্রবল আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে দাঁড়িয়েও স্রোতের উটো দিকে মুখ ফেরাতে। এর জন্যে সাহসের প্রয়োজন ছিলো, আর প্রয়োজন ছিলো নিজস্ব চিন্তাশক্তির। সন্দেহ নেই কীটসের তা ছিলো। তাই শেলির ছায়ায় শুরু করেও তার কবিতা ভাবনা ক্রমশই সরে যাচ্ছিলো শেলি সমেত সব অগ্রজ কবিদের থেকে দূরে। একাত্মতা ও বিরোধের সে দ্বন্দ্বমুখর ইতিহাস পূর্ণায়ত হতে পারে নি শুধু অকালমৃত্যুর পরিহাসে।

১০.২ লর্ড বায়রন

ক) কবিজীবন ও রচনাপঞ্জিঃ

জর্জ লর্ড বায়রন, লর্ড বায়রন' নামে যার প্রসিদ্ধি, শেলি ও কিটসের মতোই এক স্বল্পায়ু কবি-প্রতিভা, রোমান্টিক প্রজন্মের এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। ফরাসি বিপ্লবের ঠিক আগের বছরে বায়রনের জন্ম হয় লন্ডনে, এক অসাধারণ উত্তরাধিকার ও জন্মগত প্রতিবন্ধকতা নিয়ে। ক্যাথেরিন গর্ডন এবং ক্যাপটেন 'ম্যাড জ্যাক' বায়রনের পুত্র জর্জ ছিলেন জন্মগত ভাবেই খঞ্জ। স্কটল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের বংশজাত ক্যাথেরিনের

স্বামী ক্যাপটেন বায়রন ছিলেন চরম উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী। জর্জের জন্মের পরই পাওনাদারদের তাড়নায় তিনি পালিয়ে যান ফ্রান্সে। ক্যাথেরিন পুত্র বায়রনকে নিয়ে নানা দুর্দশার মধ্যে বাস করতে থাকেন তার পিতৃপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত অ্যাবারডিনশায়ারে। জর্জের তিন বছর বয়সে মৃত্যু হয় ক্যাপটেন বায়রনের। শিশু বায়রনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় বাড়িতে এবং পলে অ্যাবারডিন গ্রামার স্কুলে। ১৭৯৮-এ দশ বছরের লালক বায়রন নটিংহ্যামশায়ারের নিউস্টেড অ্যাবের উধরাধিকারী হিসেবে যা ব্যারনের শিরোপা লাভ করেন। এরপর বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে বায়রন প্রথমে যান হ্যারো (১৮০১-১৮০৫) এবং পরে কেমব্রিজে (১৮০৫-১৮০৮)। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পাঠরত থাকাকালীন সুদর্শন তরুণ বায়রন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তার আবেগাতিশয্য, সরসতা ও স্বেচ্ছাচারী আচরণের জন্য। এই অতিনাটকীয় আচরণ, বেপরোয়া মনোভাব, নারীসহশিক্ষা ইত্যাদির সমাহারে এক অভিধার জন্ম দিয়েছিলেন বায়রন--- বায়রনিজম (Byronism)।

১৮০৭-এর জানুয়ারিতে একটি ক্ষুদ্র কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেছিলেন বায়রন— *Fugative Piecees* যার অধিকাংশ কপি কবি স্বয়ং নষ্ট করে ফেলেন জনৈক বন্ধুর এই অভিমত শুনে যে, কবিতাগুলি অধিকাংশই ছিলো বড় বেশি ইন্দ্রিয়ভারাতুর। ঐ বছরই বইটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮০৭-এর মার্চে-ই বেরিয়েছিলো তাঁর শিশুপাঠ্য কবিতার সংকলন *Hours of Idleness* যেটি 'এডিনবার্গ রিভিউ'-তে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনায় আক্রান্ত হয়। এই সমালোচনার উত্তরে রোমান্টিক কবি-লেখক যেমন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদি ও স্কটকে আক্রমণ করে বায়রন লেখেন পোপের 'ডানসিয়াড' (Dunciad)-এর মতো এক ব্যঙ্গ-কবিতা 'English Bards and Scotch Reviewers' (1809)। এই বছরই বয়ঃপ্রাপ্ত বায়রন প্রবেশ করেন 'হউস অব লর্ডস'-এ এবং তার ক্যামব্রিজের বন্ধু জন ক্যাম হবহাউসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন ভূ-মধ্যসাগরীয় দেশগুলি পর্যটনে। ১৮১১-তে ইংল্যান্ডে ফিরে তিনি লিখেছিলেন তার বিখ্যাত C*hild Harold's Pilgrimage*-এর প্রথম দুটি ক্যান্টো। অবশ্য এ লেখার

সূচনা হয়েছিলো তার সফরকালে, আলবানিয়ায়। এ-কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ ক্যান্টো দুটি লেখা হয়েছিল যথাক্রমে ১৮১৬ ও ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।

১৮১৩ থেকে ১৮১৬-র মধ্যবর্তী সময়পর্বে বায়রন লিখেছিলেন কয়েকটি রোমান্টিক কাব্য-আখ্যান *The Giaour* (1813), *The Bride of Abydos* (1813), *The Corsair* (1814), *Lara* (1814), *Jacqueline* (1814). *The Siege of Corinth Parisina* (1816) এইসব রচনার জনপ্রিয়তার সূত্রে বায়রন ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন অ্যানাবেলা মিলব্যাঙ্কের এবং তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। দুজনের মানসিক বৈসাদৃশ্য ছিলো বিস্তর এবং ১৮১৫-র ডিসেম্বরে তাদের কন্যা অ্যাডার জন্মের পর বায়রন-অ্যানাবেলার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এর পরই ১৮১৬-র এপ্রিলে বায়রন বরাবরের মতো ইংল্যান্ড ত্যাগ করেন। প্রথমে যান সুইজারল্যান্ড, যেখানে সাক্ষাৎ হয় কবি শেলি ও মেরি শেলির সঙ্গে। এই বছরই রচিত হয় *চাইল্ড* হ্যারল্ড, কাব্যের তৃতীয় ক্যান্টো এবং একটি দীর্ঘ কবিতা 'The Prisoner of Chillon'। এই সময় মেরি শেলির বৈমাত্রেয় বোন ক্লেয়ার ক্লেয়ারমন্টের সঙ্গে গোপন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বায়রন এবং ১৮১৭-র জানুয়ারি মাসে ক্লেয়ার জন্ম দেন বায়রন-কন্যা অ্যালেগ্রার। শেলি-পরিবার ঐ বছরই ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে বায়রন চলে যান ইতালিতে, ইতালির ভেনিস শহরে। এই শহরেই ১৮১৯-এ বায়রন আকৃষ্ট হন জনৈকা কাউন্টেস টেরেজার প্রতি এবং ১৮২৩ এ গ্রিসে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই সম্পর্ক বহাল ছিলো।

১৮১৭-তে বায়রন লিখেছিলেন *Thag Lament of Tasso* এবং একটি নাট্যকাব্য *Manfred*। চাইল্ড হ্যারল্ড-এর চতুর্থ ক্যান্টো রচিত হয়েছিলো ১৮১৮-তে ; ঐ বছরই একটি সামাজিক ব্যঙ্গধর্মী কবিতা 'Beppo লিখেছিলেন বায়রন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হল *Mazeppa* এবং বায়রনের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরচনা *Don Juan*-এর প্রারম্ভিক ক্যান্টোগুলি। ১৮১৯-এর শেষাশেষি টেরেজার র্যাভেনার বাসগৃহে চলে আসেন বায়রন। এখানেই টেরেজার দ্বারা প্রাণিত বায়রন লেখেন *The Prophecy of Dante* ; ইতালির জাতীয়তাবাদী আদর্শের সমর্থনে রচনাটি লিখিত হয়। র্যাভেনাতেই ১৮২১-এ বায়রন লিখেছিলেন একটি নাট্যকাবা M*arino Faliero* ; ঐ বছরই একটি

সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়েছিলো 'Sardanapalus", "The Two Foscari এবং “Cain' এবং ডন জুয়ান-এর আরো কিছু অংশ। বায়রনের কবি-খ্যাতি ঐ সময় থেকেই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিলো মহাকবি গ্যেটে ম্যানফ্রেড ট্র্যাজেডি কাব্যটি পড়ে অনুজ কবি বায়রনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন | কাউন্টেস টেরেজা তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়ার পর বায়রন, র‍্যাভেনার অদূরবর্তী একটি স্থানে বাস করছিলেন এবং কাউন্টেস-সহোদর পিয়েত্রোর উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছিলেন। এই আন্দোলন ব্যর্থ হলে পালিয়ে যান পিসায় যেখানে তাদের সঙ্গে শেলির সাক্ষাৎ হয়। অগ্রজ কবি সাদি (Southey)-র সঙ্গে ব্ল্যাকউডস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত বৈরী সমালোচনার সূত্রে ১৮১৯ বায়রনের যে বিবাদ চলছিলো তা ১৮২২-এ তীব্র আকার ধারণ করে। ‘Some Observations’ (1820)-এ সাদিকে আক্রমণ করেছিলেন বায়রন । পরের বছর তার “A Vision of Judgernment-এ ডন *জুয়ান*-এর লেখককে সাদি অভিহিত করলেন ‘Satanic School’-এর প্রবর্তক রূপে। ১৮২২-এ লেই হান্টের ‘দ্য লিবারেল' পত্রিকায় বায়রন লিখলেন এক সরস অথচ তীব্র রাজনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতা ‘The Vision of Judgement’, সাদিকে উপহাস ও আক্রমণ করে।

১৮২২-এ অ্যালেগ্রার মৃত্যুতে ও শেলি পরিবারের অন্যত্র চলে যাওয়ায় বায়রনরা চলে যান প্রথমে লেগহন ও পরে জেনোয়ায়। জেনোয়াতেই তার অসমাপ্ত ডন *জুয়ান* শেষ করার কাজে হাত দেন বায়রন। ১৮২৩-এ একটি গার্হস্থ্য-বিষাদনাটক Werner, একটি কাব্য আখ্যান The Island *এবং* একটি ব্যঙ্গ কবিতা The Age of Bronze রচিত হলো। বায়রনের আর একটি অসম্পূর্ণ নাটক *The Deformed Transformed* প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলিতে বায়রন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন তুর্কি নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেতে সংগ্রামরত গ্রিক বিদ্রোহীদের প্রতি। ১৮২৩-এর জুলাই মানে বায়রন ও তার সঙ্গীরা তুরস্কে যাত্রা করেন এই বিদ্রোহীদের আদর্শ ও লক্ষ্যের শরিক হতে। ১৮২৪-এর এপ্রিলে তুর্কি ঘাঁটি লেপান্তো আক্রমণের ঠিক আগেই ‘রিউম্যাটিক ফিভার’-এ আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত

হন বায়রন ১৮২৪-এর ১৯শে এপ্রিল। গ্রিকরা তার দেহ এথেন্সে সমাহিত করতে চাইলেও কবির দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ইংলন্ডে ; কিন্তু ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে তাকে কবরস্থ করার ব্যাপারে আপত্তি জানানো হয়। অবশেষে নটিংহামশায়ারের নিউস্টেড অ্যাবের কাছেই তাদের পারিবারিক সমাধিস্থলে সমাহিত করা হয় কবির মরদেহ। বায়রনের মৃত্যু-সংবাদ শুনে বালক টেনিসন মন্তব্য করেছিলেন—'the whole world darkened to me' . তার সমারসবির বাড়ির কাছে একটি পাথরের গায়ে ভিকটোরীয় কবি-শিরোমণি টেনিসন তার অগ্রজ কবির চিরবিদায়ের বার্তাটি খোদাই করে রেখেছিলেন—'Byron is dead',

বায়রনের কবিতা : সমুদ্র-ঝঞ্ঝায় এক অসম্ভব তটরেখার সন্ধানে

তাঁর ক্যামব্রিজের বছরগুলিতে (১৮০৫-১৮০৮) সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত, সুদর্শন বায়রন স্বেচ্ছাচারিতা ও জাঁকজমকের যে খেলায় মেতে উঠেছিলেন তার মধ্যে দিয়েই তিনি পরিণত হয়েছিলেন সাবলীল পদ্যকারে। আওয়ার্স অব আইডলনেস ছিলো সেই যুবক কবির স্বচ্ছন্দ ও প্রথাগত কাব্যানুশীলনের ফসল। বায়রনের প্রতিভার অগ্নিবর্ণ আবেগ-উন্মাদনা এই সংকলনে ধরা পড়ে নি। এই কাব্যটির বিরূপ সমালাচনা (হেনরি ব্রুম কৃত) 'এডিনবার্গ রিভিউ'-তে। প্রকাশতি হল কারন তা প্রতিভার সমূহ দাহ্য ক্ষমতা নিয়ে পালটা আঘাত হানেন। ড্রাইডেন ও পোপের ব্যঙ্গ কাব্যের ধাঁচে বায়রন লেখেন ইংলিশ বার্ডস এন্ড স্কচ রিভিউয়ার্স। জনৈক স্কচ রিভিউয়ার দ্বারা নিন্দিত হয়ে তিনি চিরাচতি অন্তমিলযুক্ত দ্বিপদী (Rhyming Couplets) ব্যবহার করে পোপের 'ডানসিয়াড'-এর অনুকরণে লিখেছিলেন এই ব্যঙ্গ-কাব্য। যথেচ্ছভাবে আক্রমণ করেছিলেন সমকালীন কবি লেখকদের; সাদি, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও স্কটকে। অবতির্ণ হয়েছিলেন 'অষ্টাদশ শতকের বৌদ্ধিক প্রাখর্য ও শৃঙ্খলার সমর্থকের ভূমিকায়, রোমাট্রিকদের শৃঙ্খলাহীনতার বিরুদ্ধে। ব্যঙ্গ-বিদ্রপের তীব্র আঘাতে এ ভাষার তির্যক সরসতায় এ ব্যঙ্গরচনাটি ছিলো কবি বায়রনের কবিত্বশক্তি ও মেজাজের উপযুক্ত নিদর্শন।

বন্ধু হবহাউসের সঙ্গে ভূ-মধ্যসাগরীয় দেশগুলির সফরকালে, প্রথমে স্পেন ও পর্তুগাল ও পরে আলবেনিয়া ও গ্রিস পর্যটনের মধ্যে দিয়ে বায়রনের কবি-ব্যক্তিত্বের পরিণতি ঘটে। এই সফরসূচী থেকে আহৃত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বায়রন লেখেন তাঁর *চাইল্ড হ্যারল্ড পিলগ্রিমেজ*-এর প্রথম দুটি ক্যান্টো। এই কাব্যের ভ্রাম্যমাণ যুবক-নায়ক কবির-ই এ প্রক্ষিপ্ত চরিত্রে রূপ, এক তীর্থাত্রী' বা 'Pilgrim', সে তার শূন্যগর্ভ আমোদ প্রমোদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মহাদেশের সৌন্দর্যকেন্দ্রগুলি ঘুরে গেছে। এই নায়ক 'চাইল্ড হ্যারল্ড'— রোমান্টিক, বেদনার্ত, উচ্ছাসময়—বায়রনীয় নায়কের প্রথম উদাহরণ। পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে বায়রন লিখেছিলেন 'চাইল্ড বুরুন' নামটি, যে নামের সঙ্গে তার নিজের নামের লক্ষণীয় মিল ছিলো। পরে নাম বদল হলেও বায়রনের উদ্ধত, উচ্ছৃঙ্খল, নারীসঙ্গলোভী, বিষাদখিন্ন এই নায়ক আসলে কবি বায়রন স্বয়ং। ১৮১২-তে প্রথম দুটি ক্যান্টো প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ কাব্যটি ও কবি বায়রন বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; কবির নিজের মন্তব্যে— 'I woke One morning and found myself famous,' চার বছর বাদে প্রকাশিত এই কাব্যের তৃতীয় ক্যান্টোতে 'তীর্থযাত্রী'-র রাইন নদী দিয়ে বেলজিয়াম ও আল্পস অভিমুখে যাত্রার কথা আছে। আছে স্পেনের যুদ্ধ, ফ্রান্সে ওয়াটারলুর প্রাক্কালে নেপোলিয়নের কর্মকাণ্ড জাতীয় ঘটনা বা প্রসঙ্গ। আরো দু'বছর বাদে প্রকাশিত হয়েছিলো চাইল্ড *হ্যারল্ড*-এর চতুর্থ ক্যান্টো। নায়কের মুখচ্ছদ (personal) পরিত্যাগ করে এখানে কবি ইতালি সফরের বিবরণ তুলে ধরেছিলেন— রোম, ফ্লোরেন্স ও ভেনিস এবং এইসব শহরের কীর্তিমান প্রতিভা যেমন পেত্রার্ক, টাসো ও বোকাচ্চিও-র নানা প্রসঙ্গ বা অনুষঙ্গ। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আদলে রচিত বায়রনের এই কাব্য কিছুটা বিক্ষিপ্ত এবং তার শৈলী অনেকাংশে প্রাচীনগন্ধী। স্পেনসারীয় স্তবকে লেখা হলেও স্পেনসারের বর্ণাঢ্যতা ও স্বপ্নময় গীতিধর্মিতা বায়রনের কাব্যে নেই। মনে হতে পারে যে, বায়রন তার উপযুক্ত কাব্যমাধ্যমটি এখনো খুঁজে পান নি। কিন্তু এ-কাব্যে বায়রন আমাদের চমৎকৃত করেন ভূ-দৃশ্য বর্ণনায় তার আলাদা বৈচিত্র্য ও দক্ষতায়। যুবক ও আস্থিরচিত্ত কবি তাঁর সৃজনকর্মের এই প্রারম্ভিক পর্বেই যে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দৃশ্যমান বাস্তবকে যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন তা এককথায় অভুতপুর্ব। ভূ-দৃশ্য, রাজনীতি, ইতিহাস ও মানুষের

জীবন ও আচরণকে আশ্রয় করে এ-কাব্যের নায়ক চরিত্র চাইল্ড হেরল্ড এর বিষন্নতা ও অস্থিরতার যে মানসপটটি বায়রন আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন তার তুলনা নেই। চাইল্ড হেরল্ড এর তীর্থযাত্রার প্রথম ক্যান্টোয় রয়েছে পর্তুগাল ও স্পেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত। দ্বিতীয় ক্যান্টোর বিষয় আলবানিয়া ও গ্রিস। বিশেষত গ্রিসের মানুষ, প্রকৃতি, প্রাচীন ঐতিহ্য বায়রনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিলো ; তুর্কি প্রভুদের বিরুদ্ধে গ্রিকদের বিক্ষোভ-বিদ্রোহ তাকে আলোড়িত করেছিলো রাজনৈতিক মুক্তির মহতী আবেগে। বিস্মৃত ও হতমান *ঐশ্বর্যের* বেদনা সঞ্চারিত হয়েছিলো গ্রীস দেশের প্রতীকে আর তার মধ্যে দিয়েই বায়রন ধরতে পেরেছিলেন নশরতা ও অমরত্বের যুগলবন্দির বিষয়টিকে : 'Yet if, as holiest men have deemed, there be/A land of souls beyond that sable shore,/To shame the doctrine of the sadducee/And sophist, madly vam of dubious lore :/How sweet it were in concert to adore/With those who made our mortal labours light!' গ্রিক,আলবেনীয় ও তুর্কি জীবনযাপনের প্রোজ্জ্বল বর্ণনা শেষ হয়েছে গ্রিসের বর্তমান অবক্ষয়জনিত কারণে পীড়িত কবির শোকজ্ঞাপনে। দ্বিতীয় ক্যান্টোর শেষে রণিত হয়েছে ক্ষয় ও মৃত্যুর অনিবার্যতায় জাত এক বিশ্ববেদনা (Weltschmerz)।

চাইল্ড হ্যারল্ডস পিলগ্রিমেজ এর প্রথম দুটি ক্যান্টো বায়রনকে রাতারাতি যে কবি-খ্যাতি এনে দিয়েছিলো তারই প্রভাবে অসম্ভব দ্রুততায় ও প্রযত্নহীন স্বাচ্ছন্দ্যে বায়রন লিখে ফেলেছিলেন এক গুচ্ছ রোমান্সধর্মী কাব্য-আখ্যান, নিজেকে উপস্থিত করেছিলেন ওয়ালটার স্কটের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিলো প্রেম ও বীরত্বের এই অতিনাটকীয় কাহিনি-কাব্যগুলির প্রথমটি *The Giaour, ঐ* বছরেরই ডিসেম্বরে দ্বিতীয় রচনা— *The Bride of Abydos*, তুরস্কের প্রেক্ষাপটে সেলিম ও জুলেখার আবেগমথিত করুণ প্রেমকাহিনি। পরের বছর একই বিষয় ও আঙ্গিকে বায়রন লিখেছিলেন The Corsair এবং Lara। জনৈক গ্রিক জলদস্যু কনরাড, তার প্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কি পাশা সৈদ, কনরাডের দুই প্রণয়িনী মেডোরা ও গুলনারকে নিয়ে শৌর্য-বীর্য-প্রেম-হিংসার এক জমজমাট আখ্যান The Corsair, যার নায়কই ছদ্মবেশে

লারা হয়ে আবির্ভূত হয় Lara আখ্যান-কাব্যে। উদ্দাম ও অতিনাটকীয় এই রোমান্সগুলিতে প্রাচ্যদেশীয় প্রেক্ষিতে বায়রন রচনা করেছিলেন অবৈধ প্রণয়, অজাচার, বীরত্ব ও দম্ভের গথিক আখ্যান। প্রতিটি কাব্যের নিঃসঙ্গ, খেয়ালি নায়ক চরিত্রের আবেগ বাসনার। উদ্দামতার অন্তরালে ছিলো বায়রনের নায়ক চরিত্রের প্রক্ষিপ্ত প্রতিকৃতি। হারফোর্ড এই রোমান্সগুচ্ছ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "The flagging interest of the public in metrical tales instantly revived when the hackneyed romance of Border chivalry was replaced by the melodrama of oriental crime, and Scott's flowing but often featureless verse by Byron's unfailing resonance and glitter. Love was no longer the decorous emotion which Scott depicts, but a voluptuous and lawless passion : battle was painted with a keener zest for blood and pain. We watch the hero carry off his mistress by night from her father's house : we see the bullet rend the flesh, and dawn glimmer on the rotting body and the gnawn skull.' কাব্যরীতির ক্ষেত্রেও বায়রন পাঠকসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন 'octosyllabic couplet' ও 'heroic couplet'-এর প্রয়োগনৈপুণ্যে। ১৮১৬-র শুরুতেই ওরিয়েন্টাল রোমান্সের এই ধারাতেই বায়রন লিখেছিলেন The Siege of Co*rinth* ও অবৈধ প্রেম ও প্রতিহিংসার কাহিনী *Parisina*। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক কর্তৃক করিন্থ অবরোধের প্রেক্ষাপটে রচিত The Siege of Corinthi *ছি*লো প্রেম ও আত্মবলিদানের এক উত্তাল আখ্যান। Parisina-র কাহিনি বায়রন সংগ্রহ করেছিলেন গিবনের রচনা থেকে।

১৮১৬-তে বরাবরের মতো ইংল্যান্ড ত্যাগ করার পর প্রকাশিত হয়েছিলো *চাইল্ড হ্যারল্ড* কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ ক্যান্টো (১৮১৬ ও ১৮১৮)। ক্রমে চাইল্ড হ্যারল্ডের মুখচ্ছদটি বর্জন করে বায়রন স্বয়ং হয়ে উঠেছেন তার কাব্যের বিষয়, আত্মজিজ্ঞাসু, সমাজ-পরিত্যক্ত নায়ক। তৃতীয় ক্যান্টোর শেষভাগে বায়রনের আত্মকথনে ধরা পড়ে তার দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ, তার আর্ত উপলব্ধি---'I have not loved the world, nor the world me./But let us part fair foes..' ইতালির শহর ও নিসর্গ প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে তীর্থযাত্রী চতুর্থ ক্যান্টোতে পৌঁছন এক বিষাদঘন অনুভবে—

In Venice Tasso's echoes are no more,

And silent rows the songless gondolier ;

Her palaces are crumbling to the shore,

And music meets not always now the ear:

Those days are gone—but beauty still is here.

States fall, arts fade-but Nature doth not die....

১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিলো *The Prisoner of Chillion*, এক কাব্য-কাহিনি, একোক্তি বা monologue'-এর রীতিতে লেখা। এই কবিতার মুখ্য চরিত্র এক কারাবন্দি, যে তার দীর্ঘ ও নিষ্ঠুর বন্দিদশার ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলো এক মর্ষকামী আনন্দে। *চাইল্ড হ্যারল্ড* কাব্যের তৃতীয় ক্যান্টোর লেখার সম সময়েই বায়রন লিখছিলেন তার উল্লেখযোগ্য নাট্যকাব্য *Manfred* এ কাব্যের নায়ক গে্যটের হাউস্টের মতো পাপবোধ ও অনুশোচনায় পীড়িত এক রহস্যময় সমাজ-বিবর্জিত চরিত্র, যে বাস করে আল্পস অঞ্চলের এক দুর্গে। তার সঙ্গে সংযোগ অতিপ্রাকৃত ও অশুভ নানা শক্তির। এদের সাহায্যে তার মৃত বোন অ্যাসটারটের প্রেতচ্ছায়াকে ডেকে আনে ম্যানফ্রেড, যে অ্যাসটারটের সঙ্গে ছিলো ম্যানফ্রেডের এক অবৈধ প্রণয়-সম্পর্ক। যা থেকে তার পাপবোধের উৎপত্তি। অ্যাসটারটের প্রেত-মুর্তি ভবিষ্যদ্বাণী করে যে পরের দিনই ম্যানফ্রেডের মৃত্যু হবে। অশুভ আত্মারা ম্যানফ্রেডকে নিয়ে যেতে এলে ম্যানফ্রেড তাদের প্রত্যাখ্যান করে। প্রেতচ্ছায়ার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ম্যানগ্রেডের মৃত্যু হয়ে বটে, কিন্তু মৃত্যুতেও সে হয়ে থাকে তার আপন ভাগ্যের নিয়ন্তা। মহাকবি গ্যেটের ফাউস্ট পড়েছিলেন বায়রন এবং তার এই ফ্যানটাসি ও তার কেন্দ্রীয় চরিত্রের রূপায়ণে গ্যেটের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। এছাড়া বায়রন নিজেই বলেছিলেন যে, আল্পসের ভয়ঙ্কর নিসর্গসৌন্দর্য এই কাব্য-কাহিনি রচনায় তাকে প্ররোচিত করেছিলো। তবে M*anfred* কাব্যের সর্বাধিক মূল্য বায়রনের মনস্তত্ত্বের এক উন্মোচক দলিল হিসেবে।

রঙ্গ-পরিহাসে উপভোগ্য *Beppo* এক ভেনিসীয় উপাখ্যান। 'মক্-হিরোইক' (mock herioc) রীতিতে লেখা এই কাব্যে ৯৯টি স্তবকে, ইতালীয় কবিদের কাছ থেকে শেখা 'ottava rima' ছন্দে, বায়রন বিবৃত করেছিলেন এক মজাদার প্রণয়চতুরালি। জনৈক সৈনিক বেপ্পো সমুদ্রে নিখোঁজ ও সম্ভবত মৃত ; তার স্ত্রী অন্য এক পুরুষের সঙ্গে প্রণয়-সংসর্গে লিপ্ত। অবশেষে এক উৎসবের দিন তুর্কি ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ফিরে আসে বেপ্পো গল্প হয়তো শেষ হতে পারতো দ্বন্দ্বযুদ্ধ কিংবা বিচ্ছেদ কিংবা সামাজিক ন্যায়বিচারে ; বায়রনের কাব্যে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যায় কফির টেবিলে। ভেনিসের এই গল্প ও তার ভেনিসীয় পরিণতি থেকে বোঝা যায়। ইতালির এই শহরের চাপল্য ও পরিহাসপ্রিয়তা বায়রনের জীবনবোধ ও কাব্যভাবনাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছিলো। প্রথম যৌবনের উদ্দামতা, ঔদ্ধত্য ও বিমর্ষতা কাটিয়ে এক ভিন্নতর দিশায় যাত্রা শুরু করেছিলেন বায়রন। স্পেনসারীয় স্তবকের বিস্তারের পরিবর্তে আট পংক্তি 'Ottava rima'- কেই কবিতার কাব্যের উপযোগী বলে মনে করেছিলেন। আঙ্গিক ও ভাবনায় ডন জুয়ান-এর কবিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো।

ভলতেয়ার-এর Hisitoira de varles (1731) গ্রন্থে ইভান স্তেপানোভিচ মাজেপ্পার যে গল্পটি ছিলো তাকে অবলম্বন করে বায়রন লিখেছিলেন তার 'Mazzeppa' কবিতাটি। অভিজাত পোলিশ বংশোদ্ভূত মাজেপ্পা পোল্যান্ডের রাজার বালক-ভৃত্য রূপে তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন। পরে এক ধনী ব্যাবসায়ীর স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে মাজেপ্পাকে নগ্ন অবস্থায় একটি পাগলা ঘোড়ার পিঠে বেঁধে বিতাড়িত করা হয়। ভাগ্যক্রমে মাজেপ্পা ইউক্রেনে স্থানীয় অধিবাসীদের শুশ্রুষায় রক্ষা পান ও তাদের নেতৃপদে বৃত হন।

১৮১৮-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৮১৯-এর নভেম্বরের মধ্যে বায়রন লিখেছিলেন তার মহাকাব্যোপম ব্যঙ্গ রচনা *Don Juan*-এর প্রথম চারটি ক্যান্টো। বেপ্পোর রীতি ও ভঙ্গীতে কিছুটা সংশয় নিয়ে স্পেনীয় যুবক ডন জুয়ানের কীর্তিকলাপের যে আখ্যান শুরু করেছিলেন বায়রন তা শেষ পর্যন্ত ষোলো ক্যান্টোর বিস্তৃতি অর্জন করেও কবির মৃত্যুতে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কাব্যের শুরুতে ষোলো বছরে সুদর্শন ডন জুয়ান ডোনা

এলিয়ার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তার বাসভুমি সেভিল থেকে বিতাড়িত হয়। ক্যাডিজ থেকে সমুদ্রযাত্রায় জুয়ানের জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে ও জাহাজ ডুবি হয়। একটি নৌকায় ভেসে ও নানা বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে দিয়ে ডন এসে পড়ে একটি গ্রক দ্বীপে। তাকে সুস্থ করে সুন্দরী জলদস্যু কন্যা হেইডি, ডন ও হেইডি পরস্পরে প্রণয়াসক্ত হয়। তাদের প্রণয়ক্রীড়ায় ছেদ ঘটে জলদস্যু ল্যাম্ব্রো ফিরে আসায়। ল্যাম্ব্রো শৃঙ্খলিত ডনকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। শোকার্ত হইডি পতিত হয় মৃত্যুমুখে। ডনকে কিনে নেন কনস্তানতিনোপল-এর এক সুলতানা ; তিনি ডনকে প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ডন জুয়ান অতঃপর পালিয়ে গিয়ে যোগ দেয় রাশিয়ার সেনাদলে, যে সেনাদল সে সময় ইসমাইল অবরোধে ব্যাপৃত ছিলো। বিশেষ কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ডনকে পাঠানো হয় সেন্ট পিটার্সবার্গে, যেখানে সে সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিনের নজরে পড়ে। সম্রাজ্ঞী তাঁকে কুটনৈতিক দায়িত্ব দিয়ে পাঠান ইংল্যান্ডে। সেখানে ডন যথাপূর্ব নানা প্রণয় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে থাকে। ডনের এইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বায়রন তুলে ধরেন ইংল্যান্ডের সমাজ ও রাজনীতির সমালোচনামুলক ব্যঙ্গচিত্র।

বায়রনের শ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তি *ডন জুয়ান* স্পেনদেশীয় পিকারেস্ক রোমান্সের ঘরানায় রচিত এক বিশালায়তন বঙ্গকাব্য। এ-কাব্যের সুদর্শন যুব-নায়ক ডন কিন্তু তার বহু বিচিত্র প্রণয় সম্পর্ক ও রুদ্ধশ্বাস কীর্তিকলাপ সত্ত্বেও আদৌ কোনো আগ্রাসী, স্বেচ্ছাচারী চরিত্র হিসেবে চিত্রিত হয় নি। সে আশ্চর্যজনকভাবে শান্ত এবং অনেকটাই সরল ; নানা জটিলতার মধ্যে দিয়ে সে যেন অভিজ্ঞতার বহুকৌণিক জগতে শিক্ষালাভ করে চলেছে। জলদস্যু-তনায় হেইডির সঙ্গে প্রণয়ক্রীড়ায় এবং অন্যান্য প্রেম-সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রেও ডন লক্ষণীয়ভাবে নিস্ক্রিয়; প্রেম ও যৌনাচারের মদির ক্রীড়াভূমিতে ডন জুয়ান যেন রূপক ব্যক্তিত্ব। কিছু অপকীর্তি, রঙ্গ-তামাশার রচয়িতা সে, কিন্তু তাকে আশ্রয় করে বায়রন আভাসিত করতে চেয়েছেন এক বিশ্বদৃষ্টি (Weltanschuauung)। *Don Juan* এমন এক ব্যঙ্গ-মহাকাব্য যা জীবনের এক সমালোচনা 'Criticism of life' যে সমালোচনায় যাবতীয় উপকরণ বায়রন সংগ্রহ করেছিলেন তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার

জগত থেকে। *চাইল্ড হ্যারল্ড*-এর নায়কের মেজাজে আচরণে যত বেশি করে বায়রনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় ডন জুয়ানের মধ্যে সই পরিমাণ আত্মপ্রক্ষেপ আমরা লক্ষ করি না। 'ডন জুয়ান' এর প্রাণবন্ত, রসগ্রাহী পর্যটনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের কাছে চাইল্ড হ্যারল্ড অনেক নিষ্প্রভ বলে মনে হয়।

ইতালীয় নবজাগরণ পর্বের কবিদের কাছ থেকে ছন্দ ও কাব্যরীতির প্রয়োজনীয় পাঠ নিয়েছিলেন বায়রন। পিকারেস্ক নোমান্সের ঐতিহ্য অনুসরণে ডন জুয়ানের ঘটনাবহুল জীবনবৃত্তান্ত এক বিশদ ও শিথিল কাঠামোয় চমৎকার বিধৃত কলেছিলেন। ডন ও ডোনা জুলিয়ার যে ঘটনা থেকে কাহিনির শুরু এবং ডনের পরবর্তী অনুরূপ অভিজ্ঞতাগুলির উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে হেনরি ফিল্ডিং-এর বিখ্যাত উপন্যাস Tom Jones-এ; তার কাব্যের দ্বিতীয় ক্যান্টো বর্ণিত জাহাজডুবির অনুপুঙ্খগুলি ড্যালজেলের *Shipwrecks and Diasters at Sea* গ্রন্থি থেকে সংগৃহীত। ডন-হেইডি প্রেমকাহিনির বর্ণময় পরিবেশ অনেকটাই মিলে যায় জন গে'র 'Daphnis and Chloe' কবিতাটির সঙ্গে। তবে এইসব সাদৃশ্য, সমান্তরালতা, প্রভাব ইত্যাদি থেকে বায়রনের কাব্যের সমগ্রতার আন্দাজ পাওয়া যাবে না। বায়রনের ডন জুয়ান কিংবদন্তির স্বেচ্ছাচারী নায়ক ডন জুয়ানের ইতিবৃত্ত নয় ; এক অর্থে বলা যায় যে, ডন জুয়ানের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্তই নয় এ কাব্য ; এ কাব্য ইউরোপের এক সামাজিক দলিল। চরিত্র হিসেবে যতখানি তার থেকে অনেক বেশি ভাষ্যকার ও বিবরনদাতা হিসেবে ডন জুয়ান এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ভেনিস শহর ও তার অদূরবর্তী র‍্যাভেনায় বসবাসের সময় বায়রনকে আকৃষ্ট ও উজ্জীবিত করেছিলো ইতালির মহাকবি দান্তের স্মৃতিসৌধ। এর আগে ট্যাসো ও মাজেপ্পার মতো যারা উৎপীড়নের শিকার তাদের প্রতি সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছিলেন বায়রন। এখন তার আলোড়িত কল্পনায় তিনি দান্তেকে গ্রহণ করলেন শুধু শারীরিক নয়, আত্মিক বা আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রতীক পুরুষ রূপে, দান্তে, 'Who has the whole world for a dungeon strong'. র‍্যাভেনা-পর্বে কাউন্টেস টেরেজার প্রাসাদে বসবাসের দিনগুলিতে বামন ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন কাউন্টেস-ভ্রাতা পিয়েত্র গ্যাম্বার। গ্যাম্বার ছিলেন কারবোনারি নামে

একটি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী সংগঠনের নেতা। সেই, সুয়ো বায়রন ক্রমে ইতালীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এসবেরই ফসল *The Prophecy of Dante* এক প্রোজ্জ্বল ও উদাত্ত বাণীশিল্প। তবে দান্তে কর্তৃক ব্যবহৃত ইতালীয় ছন্দ "Terza rima" এ কবিতায় বায়রনকে তেমন স্বাচ্ছন্দ্য দেয় নি।

বৈপ্লবিক মুক্তির উত্তাল আবেগে স্পন্দিত বায়রন ১৮২০-২১-এ পুনরায় মনোনিবেশ করেছিলেন নাট্যকাব্য রচনায়। ভেনিসের প্রেক্ষাপটে রচিত *Marino Faliero* ছিলো একটি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি নাটক। চতুর্দশ শতকের এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, তার প্রতিশোধস্পৃহা ও করুণ পরিণতির মধ্যে দিয়ে স্বদেশ ও সুজন পরিত্যক্ত বায়রন দেখাতে চেয়েছিলেন মুক্তির প্রতিবাদী আবেগ আকুলতা। তবে অভিনয় যোগ্য নাটক রচনায় বায়রনের কোনো সহজাত প্রতিভার পরিচয়, এই পর্বের নাটকগুলিতে নেই। অলঙ্কার ছিল, আবেগাতিশয্যচিহ্নিত ভাষা ও 'Blank Verse' ব্যবহারে বায়রনের সীমাবদ্ধতা তার নাটকগুলিকে সার্থক হয়ে উঠতে দেয় নি। তার অপর একটি ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি *Sardanapalus*-এর ঘটনাস্থল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের সিরিয়া। রাজা সারদানাপলুস এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও রাজা পরাস্ত হন বিদ্রোহীদের কাছে এবং তার প্রিয় সঙ্গিনী ও অন্যান্য সহচরদের নিয়ে জলন্ত চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। অমিতব্যায়ী, বিলাসী ও কোমলস্বভাব রাজা সারদানাপালুস যেন কবি বায়রনের ব্যক্তিসত্তার একটি প্রতিরূপ। ভেনিসের পটভূমিতে রচিত বায়রনের আর একটি নাটক *The Two Foscari* পঞ্চদশ শতকের ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে লেখা ট্র্যাজেডি। বৃদ্ধ বিচারপতি ফ্রানসিসকো ফসকারি ও তার ছেলে জাকোপা ফসকারি এই নাটকের দুই মুখ্য চরিত্র। দুবার নির্বাসিত জাকোপোকে ক্রিটে ফিরিয়ে আনা হয় তার বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র ও হত্যার অভিযোগের বিচারের উদ্দেশ্যে। এবারে জাকোপোকে বরাবরের জন্যে নির্বাসত করা হয় এবং এই দণ্ডাদেশ শুনে প্রাণত্যাগ করে জাকোপো। অতঃপর বৃদ্ধ ফ্রানসিসকোও মৃত্যুমুখে পতিত হন। মধ্যযুগের ধর্মীয়/নীতি নাটকের আদলে বায়রন লিখেছিলেন তিন অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক ‘Cain’, যাকে তিনি অভিহিত করেছিলেন 'A Mystery' নামে। ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্ব

নিয়ে লেখা এ নাটকে কেইনের লুসিফারের শরণাপন্ন হওয়া, তার বিশ্বপরিক্রমা, কেইন কর্তৃক অ্যাবেল নিধন। এবং হত্যাকারী কেইনের নির্বাসন স্থান পেয়েছে। বায়রনের এ-নাটককে ধমর্যাজক ও সমালোচকেরা খ্রিস্টধর্ম বিরোধী বলে মনে করেছিলেন। এ-নাটকটিও মঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে উপযুক্ত ছিলো না।

রাজা তৃতীয় জর্জের মৃত্যুতে 'পোয়েট লরিয়েট' সাদি যে স্তুতিমূলক শোককবিতা *এ Vision of Judgement* লিখেছিলেন তাকেই ব্যঙ্গ করে বায়রন লিখলেন *The Vision of Judgement* যা ইংরেজি ভাষার অন্যতম সেরা ব্যঙ্গকবিতা। বায়রন সাদির কবিতার মহত্ত্ব ও প্রশংসাসূচক বিবরণ বা প্রসঙ্গগুলি অত্যন্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণাভরে উল্টে দিয়েছিলেন বিদ্রুপ ও শ্লেষে। অষ্টাদশ শতকের ব্যঙ্গ লেখকদের থেকে বায়রনের পদ্ধতি ভিন্নতর ছিলো। ড্রাইডেন- পোপের মতো উপহাসের উপজীব্য ব্যক্তি বা প্রসঙ্গের উপস্থাপনায় কোনো শিল্পসৌন্দর্য ও গুরুত্বকে আমল না দিয়ে বায়রন রাজা তৃতীয় জর্জ ও তার চাটুকার কবিকে অবহেলাভরে নামিয়ে এনেছেন তুচ্ছ প্যারডির পর্যায়ে। উদাহরণস্বরূপ রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে জাঁকজমকের আয়োজন ছিলো তাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছিলেন বায়রন এইভাবে—'It seemed the mockery of hell to fold/The rottenness of eighty years in gold.' সেন্ট পিটার ও শয়তানের চরিত্র দুটি বিশেষ উপভোগ্য। অনুরূপ উপভোগ্য মাইকেল ও শয়তানের মধ্যেকার বিনিময়।

র‍্যাভেনা থেকে পিসায় চলে আসার পর 'ডন জুয়ান'-এর উত্তর-পর্বের ক্যান্টোগুলি রচনার ফাঁকে ফাঁকে বায়রন লিখেছিলেন একটি ট্রাজেডি নাটক *Werner*, একটি কাব্য-কাহিনী The *Island* এবং একটি ব্যঙ্গ কবিতা "The Age of Bronze'। তার কবি প্রতিভার ক্রম ক্ষীয়মাণতার ইঙ্গিত বহন করে এই রচনাগুলি। একই কথা বলা চলে তার অসমাপ্ত নাটক The *Deforesed TransforPed প্রসঙ্গে*ও। এই নাটকের নায়ক বায়রনের মতোই শারীরিক প্রতিবন্ধী যে পরিণত হয় ফাউস্টের মতো এক দানবীয় ব্যক্তিত্বে। ভাষা, ছন্দ ও কল্পনার দুর্বলতাও এখানে স্পষ্ট।

বায়রনের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রসঙ্গসমূহ

১. অস্মিতা (Egoism): রোমান্টিক কাব্য-কবিতা সাধারণভাবে অস্মিতা-নির্ভর। কবির জীবন ও ব্যক্তিত্ব থাকে বিষয় ও প্রকরণের কেন্দ্রে, সৃজনের প্রধান উৎসরূপে। বায়রনও তার চলার পর রচনায় ছড়িয়ে দিয়েছেন আত্মজীবন। সমাজ, ইতিহাস ও প্রকৃতির যাবতীয়। প্রসঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে অবলম্বন করেই। বায়রনের কাব্য-প্রতিভার পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তার সৃষ্ট নামক চরিত্রগুলি সবই কবির নানা মেজাজ ও ভঙ্গির প্রতিছবি মাত্র। ভূমধ্যসাগরীয় পরিক্রমায় ব্রতী চাইল্ড হ্যারল্ড কিংবা The Corsair ও Lara' র মতো আখ্যানের আবেগতাড়িত, নিঃসঙ্গ নায়কেরা কিংবা সমাজচ্যুত, ফাউস্ট-সদৃশ ম্যানফ্রেড কি সুদর্শন যুবক-নায়ক ডন জুয়ান—এরা সকলেই বায়রনের জটিল ব্যক্তিসারই নানা প্রক্ষিপ্ত রূপ। এই অস্মিতার আলাকে দেখলে আমরা বায়রনের কালের নায়কদের স্পষ্টভাবে চিনতে পারবো। বায়রনের মতো এই নায়কের জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বিক্ষোভ ঐ বিতৃষ্ণায় তিক্ত ও বিষন্ন ; স্বাধীনতার অদম্য বাসনা, প্রচলিত নৈতিকতা লঙ্ঘন করে সামাজিক শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করা, এক অপরাজেয় অহংবোধ ইত্যাদি এইসব নামকদের চিনিয়ে দেয় তাদের রচয়িতার আত্মপ্রতিকৃতিরূপে।

২. বিপ্লবের স্পৃহাঃ সামাজিক ও ধর্মীয় ভণ্ডামি, রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর, রক্ষণশীল নীতি নৈতিকতার বিরুদ্ধে বায়রন ছিলেন এক সোচ্চার বিপ্লবী কণ্ঠ। জন্মগত শারীরিক ত্রুটি পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, স্বভাবগত উদ্দামতা, স্বদেশ ও স্বজনদের বৈরী মনোভাব বায়রনকে দেশ-দেশান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। জীবনকে তিনি মনে করতেন 'false nature", এক কঠিন ব্যাধি ‘hard disease’ এক অনপনেয় কলঙ্কচিহ্ন ‘ineradicable taint of sin’ এবং তিনি নিজে সেই জীবনের এক অসহায় শিকার। এই বোধ তাকে চালিত করেছিলো সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিপ্লবাত্মক আবর্তে। ইতালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কিংবা জীবনের অন্তিম পর্বে গ্রিক বিদ্রোহীদের সমর্থনে আমরা তাকে সর্বস্ব পণ করতে দেখেছি। বায়রনের এই প্রতিবাদী চরিত্র, এই বিপ্লবী আবেগ অভিব্যক্তি লাভ করেছে চাইল্ড হ্যান্ডের তীর্থযাত্রায়, দ্য ল্যামেট অব ট্যাসো, দ্য প্রফেসি অব দান্তে, ‘দ্য সিজ অফ করিন্থ’ ইত্যাদি রচনায়। ম্যাথু

আরনল্ড বায়রনকে দেখেছিলেন এইভাবে—"The passionate and dauntless soldier of a forlorn hope who, ignorant of the future and unconsoled by its promises, nevertheless waged against the conservatism of the old impossible world a fiery buttle.' প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্র ও যাজকতনের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বায়রনের মতো অপর কোনো রোমান্টিক কবিকে আমরা সোচ্চার হতে শুনি নি। স্যার মরি বাওয়া বায়রনের এই বিপ্লবী স্পৃহা সম্পর্কে মুল্যবান মন্তব্য করেছেন—"Much more than Wordsworth and Coleridge, who after their first enthusiasm for the French Revolution, surrendered to caution and scepticism, more even than Keats whose love of liberty was hardly developed to its full range, Byron wished to be free and insisted that other men must be free too." সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বাসনায় বায়রন শেলির সতীর্থ, যদিও শেলির মতো কোনো স্বর্ণযুগের স্বপ্নদ্রষ্টা তিনি ছিলেন না। বায়রন শেলির মতো আধ্যাত্মবাদী ও ভবিষ্যৎবাদী কবি নন । তিনি তার সমকালীন বাস্তব জগতে পীড়িত মানবতার বন্ধনমুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের শরিক হতে চেয়েছিলেন।

৩. রোমান্টিকতাঃ

রোমান্টিক কবি প্রজন্মের অন্যতম হিসেবে আলোচিত হলেও বায়রনের রোমান্টিকতা কিছু ভিন্ন গোত্রের। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, কিটস, স্কট প্রমুখ কবি-লেখকদের সম্পর্কে বায়রনের শ্রদ্ধার অভাব ছিলো। এরা ও বিভিন্ন সময়ে নীতিহীনতা, শৈলী ও কল্পনার ঘাটতি ইত্যাদি অভিযোগে বায়রনকে অভিযুক্ত করেছিলেন। কোলরিজ তার উত্তর-পর্বের কবিতাকে বলেছিলেন ‘Satanic’; কিটস তার ভাই জর্জকে ১৮১৯-এর সেপ্টেম্বরে একটি চিথিতে লিখেছিলেন –‘You speak of Lord Byron and me- There is this great difference between us. He describes what he sees--I describe what I imagine’.

একথা ঠিক যে বায়রন রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রীয় স্বীকার্য ‘ইমাজিনেশন’-এর ধারণাকে বর্জন করেছিলেন। এক বাস্তবতার বোধ ও অষ্টাদশ শতকের ধ্রুপদি

(Classicisin) রূপ-রীতি আদর্শ বায়রনকে ব্লেক থেকে গেলি পর্যন্ত ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের ভাবনা ও প্রকরণ থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছিলো। বায়রনের বিপ্লবাত্মক মানসিকতা ড্রাইডেন ও পোপের নব্য ধ্রুপদি যুগের কবি লেখকদের অনুসরণে সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শানিত মাত্রা লাভ করেছিলো। বায়রন পরিণত হয়েছিলেন, এলটনের ভাষায় “the social critic of the romantic age'-এ। তবুও রোমান্টিক কবিরূপে বায়রনের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার প্রকৃতিপ্রেম। ম্যাথু আরনল্ড বায়রনের প্রকৃতিপ্রেমের শিকড়টিকে কেল্টিক অনুভব ও উদ্দীপনার গভীরে প্রোথিত বলে মনে করেছেন, ঠিক যেমন আরনল্ডের বিচারে বায়রন তেজী, দ্রোহাত্মক মানসপ্রবণতার উৎসে ছিলো "the Titanism of the Celts"। প্রকৃতির মধ্যে কোনো অলৌকিক রহস্য বা আধ্যাত্মিক বীক্ষার সন্ধান করেন নি বায়রন। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা রূপে খুঁজে পেয়েছেন আনন্দ, রোমাঞ্চ, উত্তেজনা ; প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের রূপ-রূপান্তরে বায়রন বুনে গেছেন তার জীবন ও ব্যক্তিত্বের সুত্র গুলি। প্রকৃতি সম্পর্কে বায়রন দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরনল্ড লিখেছিলেন—“The CeIt's quick feeling for what is roble and distinguished gave his poetry style : his indomitable personality gave it pride and passion : his sensibilities and nervous exaltation gave it a better gift still, the gift of rendering with wonderful felicity the magical charm of nature.' প্রকৃতির উদ্দাম ও হিংস্র দিনগুলির ছবি তুলে ধরেছেন বায়রন কোনো নীতিতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক প্রেরণার সন্ধান না করে। মরিস বাওরা বায়রনের প্রকৃতি-বিষয়ক আগ্রহের এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—“The helplessness of man before nature was a subject from which the Romantics shrank, but Byron saw it and spoke sincerely about it."

রোমান্টিক কবিত্ব বা কল্পনার তত্ত্বে আস্থাশীল না হলেও বায়রন রোমান্টিক নবি-লেখকদের কিছু কিছু বিষয় ও প্রসঙ্গ নিয়ে তার ভাবনার প্রমাণ রেখেছেন। প্রেম ও প্রকৃতি ছিলো তার কাব্য-প্রতিভার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এছাড়া বিষয়তা, আত্মপ্রক্ষেপ,

রোমান্সপ্রীতি ও ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শে প্রাণিত বিপ্লববোধ তার কবিতার কয়েকটি রোমান্টিক প্রজন্ম লক্ষণ।

৪. ক্ল্যাসিসিজম (Classicism): পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে যে, রোমান্টিক কাবাদর্শের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় পরিকল্পনা সম্পর্কে বায়রন বীতরাগ ছিলেন। তার সামনে ইংল্যান্ড ও ইওরোপের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা বায়রনের কাছে অনেক বেশি অভিনিবেশ দাবি করেছিলো। কল্পনার পাখায় উড্ডীন না হয়ে বানান বাস্তববোধ ও মননশীল দৃষ্টিতে তার সমকালীন অভিজ্ঞতার জগৎ এবং তার নিয়ম-প্রথা-কাপট্য ইত্যাদিকে উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। কিটসের মতো অতীতচারিতা কি শেলির মতো দূর ভবিষ্যতের স্বপ্নদর্শন।

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস নয়, বায়রন তার বর্তমানকেই দেখাতে চেয়েছিলেন তার যাবতীয় ভালো ও মন্দ সহ। ডন জুয়ান কাব্যে এই বাস্তব ও বর্তমানের প্রতি তার মানসিক সংসর্গের কথা বায়রন নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন-

‘I mean to show things really as they are/nor as they ought to be, for I vow. /That till we see what's what in fact, we're far/From much improvement.’

রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্ব পরিহার ও অষ্টাদশ শতকের ‘নিও-ক্লাসিকাল সাহিত্যাদর্শের সমর্থন বায়রনের কাব্য-কবিতাকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। পোপ ও সুইফটের মতো বায়রন ব্যঙ্গরচনায় ছিলেন বিশেষভাবে দক্ষ। এক ধরনের মহিমময় অস্মিতার লক্ষণযুক্ত বিদ্বেষ ও গুণ বায়রনের কাব্য-কবিতার প্রধান উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। তবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই তিনি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিলেন এবং তার ব্যঙ্গের নির্মমতার অন্তরালে সহানুভূতির কোনাে আদ্রতা ছিলাে না। প্রসঙ্গত আলবার্ট মন্তব্য করেছেন যে, “He lacks the deep vision of the supreme satirist, like Carvantes, who behind the shadows of the crimes and follies of tner can see the pity of it all', কাব্যশৈলী, বিশেষত পোয়েটি ডিকশন’-এর বিষয়ে

বায়রন ছিলেন পোপের নিখুত ও পরিশীলিত ঔজ্জ্বল্যের অনুরাগী। এ ব্যাপারে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ রোমান্টিক কবিদের, এমনকি নিজের রচনা সম্পর্কেও ছিলেন ভীষণ অখুশি।

১০.৩ অনুশীলনী

১।শেলীর কবিতায় রোমান্টিক তত্ত্বের প্রতিফলন উদাহরণ সহ আলোচনা করো।

২।রোমান্টিক তত্ত্বে কীটসের অবদান আলোচনা করো।

৩।বায়রনের কবিতার প্রধান বিশিষ্টগুলি আলোচনা করো।

১০.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১।Hisory of modern criticism –Rene Wellek

২।Literary criticism: A short history-Wilmsatt.J.& books

৩।The mirror and the lamp-M.H Abrams

একক ১১ - রোমান্টিক গদ্য সাহিত্য

বিন্যাস ক্রম

১১.১ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট

১১.২ চার্লস ল্যাম্ব

১১.৩ অনুশীলনী

১১.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১১.১ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট

জীবনী ও রচনা পরিচিতি রোমান্টিক ভাবকল্পনার এক অভিনব নিদর্শন ঐতিহাসিক উপন্যাস, যার আবির্ভাবলা হিসেবে উনিশ শতকের প্রারম্ভিক সময়-পর্বকে চিহ্নিত করেছেন বিশিষ্ট সমালোচক জর্জ লুকাচ (Lukacs)। অবশ্যই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ঐতিহাসিক বিষয় বা উপাদান অবলম্বনে। উপন্যাস রচনার কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিলো । কিন্তু সেইসব নৃচনায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, সাজ-পাোশাকের আড়ম্বর ইত্যাদি গুরুত্ব পেয়েছিলো। একটি যুগের সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্র, বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের ও ঘটনার নিরপেক্ষ ও শিল্পসম্মত উপস্থাপনা এবং সর্বোপরি এক অবিকৃত, বাস্তবসম্মত পটভুমি উনিশ শতকের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস তথা রোমান্সে পাওয়া যায়নি। এমনকি হোরেস এন ওয়ালপোল (Walpole) রচিত এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে অভিহিত *The Castle of Otranto* সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। স্যার ওয়ালটার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) ইংরেজি ঐতিহাসিক উপন্যাসের জনকরূপে সর্বজনস্বীকৃত। ওয়ালপোল প্রমুখের রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসে মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে স্কুল ও বাহা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিলো । কিন্তু প্রকট তার কল্পনা ও শিল্পবোধের সমগ্রতায় দুরবর্তী এবং নাতিদূর অতীতের যে

প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য পুনর্নির্মাণ। পাঠকদের উপহার দিলেন তা ছিলো এক কথায় অভূতপূর্ব। অতীতের মনোহর স্বপ্ন, ঐতিহাসিক দুর্গে ও প্রাসাদে শৌর্য-ঐশ্বর্যের স্মৃতি, ঘটনার ঘনঘটা তথা চরিত্রের চলমানতা নিয়ে এক পুনর্জীবিত ঐতিহাসিক চলচ্ছবি স্কটের পূর্ববর্তী কোনো রচনায় পাওয়া যায়নি। সমকালীন বা ঈষৎ পূর্ববর্তী উপন্যাসকারেরা যখন মোটের ওপর বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর, সামাজিক জীবনের বিস্তারিত পর্যালোচনায় নিযুক্ত রেখেছিলেন নিজেদের, তখন স্কট ডুব দিয়েছিলেন অতীত ইতিহাসের বিচিত্র ও দুঃসাহসিক গভীরতায়। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড তথা মহাদেশীয় অতীত ইতিহাসের রোমাঞ্চকর অভিযান, মধ্যযুগীয় দুর্গ-প্রাসাদ-গীর্জা সমাধিক্ষেত্র তথা গিরি-প্রান্তর পরিখার বিচিত্র চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার উপন্যাসগুলিতে। তথ্যের প্রামাণিকতা নিয়ে কিছু কিছু সংশয় থাকলেও অতীত ইতিহাসের বীর্যবত্তার যে স্পন্দিত উল্লাস স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে অনুভূত হয় তার তুলনা হয় না।

সাহিত্যজগতে স্কট প্রবেশ করেছিলেন কবিরূপে। বাল্যকাল থেকেই স্কটের ছিলো অসাধারণ আতিশক্তি আর ছিলো দুরন্ত আগ্রহ রূপকথা, প্রাচীন লোকগাথা ও রোমান্সধর্মী আখ্যায়িকাগুলিতে । কবি হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ রোমান্স ও গাথাকবিতার অনুবাদক ও রচয়িতার ভূমিকায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে টমাস পার্সি (Percy)-র Reliques of Ancient English Poetry বালক ওয়ালটারকে যেভাবে পেয়ে বসেছিল তার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া পরিণত বয়সেও সম্ভব হয় নি। সাহিত্যের একেবারে প্রাথমিক পর্বে The Minstrels of the Scottish Border (1802-1803) The Lay of Last Minstrel (1805) ও Marmion (1808)-এ স্কট ইতিহাসের কাঠামোয় রোমান্টিক গাথা পরিবেশনে যে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন তাতেও সেই প্রভাবের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। দুটি ক্যান্টোর দা রোমান্স-কাব্য দ্য লে অফ লাস্ট মিন্সট্রেল এ কাহিনি নির্মাণে ও শৈলীর প্রাণবন্ত ঐশ্বর্যে স্কট তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এই কাব্যের জনপ্রিয়তায় প্রায় স্কুট লিখেছিলেন রাজা অষ্টম হেনরির জনৈক সহচর মারমিওনের প্রণয়, চক্রান্ত এ পরিশেষে ফ্লাডেনের যুদ্ধে তার নিহত হওয়ার এক চমকপ্রদ কাব্যকাহিনি মারমিওন। এর পরে স্কট লেখেন 'The lady of the Lake (1810). The Bridal of Thiermain (1813) The Lord of the Isles

(1814)-এর মতো দীর্ঘ কবিতা। পূর্ববর্তী দুটি আখ্যান-কাব্যের মতো –দ্য লেডি অব দ্য লেক ছ ক্যান্টোর এক ঘটনাবহুল রোমান্স । চিত্ররূপময়র বর্ণনা ও গীতিকবিতার মাধুর্যে অনন্য। স্কটের অবিস্মরণীয় কয়েকটি গান যেমন, 'Rest, Warrior, rest', এবং 'He is gone on the Mountain' এ-কাব্যের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রোমান্স ও শিভ্যালরির সমাবেশে, দৃশ্যপটের চমকপ্রদ বর্ণনায় স্কট এখানে মধ্যযুগীয়। স্কটল্যান্ডের জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন যা পরে দেখা গিয়েছিলো তার গদ্য-আখ্যান গুলিতে। দ্য ব্রাইডাল অব ট্রায়ারমেন-এর মুল বিষয়বস্তু রাজা আর্থারের কন্যার অনুসন্ধানে ব্রতী ট্রায়ারমেনের স্যার রোলান্ডের কাহিনি।

ইতিহাস ও লোকগাথার জগতে মগ্ন এই কবি স্কটই নিজের অজান্তে গড়ে তুলেছিলেন ঔপন্যাসিক স্কটকে। "Border Minstrels"-র সংগ্রাহক এই কল্পনাপ্রবণ কবিমন ছিলো ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্মদাতা স্কটের প্রধান প্রেরণা। ১৮১৬ নাগাদ কাব্য রচনা ছেড়ে উপন্যাসের ক্ষেত্রে চলে আসেন, আর এই সিদ্ধান্তের পেছনে ছিলো কবি বায়রনের Child Harold's Pilgrimage (1810)-এর অভাবনীয় সাফল্য যা স্কটের গাথা-কাব্য ও রোমান্সের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে খর্ব করে ছিলো। তাছাড়া উপন্যাসের কাঠামো ও শৈলীর মধ্যেই স্কট তার বিস্তৃত অধ্যয়ন ও কল্পনায় যথার্থ প্রকাশের সম্ভাবনা খুঁজে পেলেন।

স্কটের প্রথম উপন্যাস Waverly (1814) বিশাল ও বিশদ ঐতিহাসিঃ পটভূমিকায় রচিত এক চমকপ্রদ ও গতিময় কাহিনি। ১৮০৫-এ কাট লিখতে শুরু করেছিলেন ১৭৪৫-এর জ্যাকোলাইট বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে এক কাহিনি। সে কারণে এই উপন্যাসের পার্শ্ব নাম (sub title) ছিলো "*Tis S*ixty *Years Since"* যুবক এডওয়ার্ড ওয়েভারলির একদল জ্যাকোবাইটের সংস্পর্শে আসা এবং স্কটল্যান্ডে সামরিক দায়িত্বে বৃত অবস্থায় তার প্রেম ও বীরত্বের এক চিত্তাকর্ষক উপাখ্যান Waverly। "ওয়েভারলি শীর্ষক একগুচ্ছ উপন্যাসের প্রথম রচনা এটি। অদূর অতীতের স্কটল্যান্ড এ তার ইতিহাস মূর্ত হয়ে উঠেছিলো স্কটের চরিত্র চিত্রণ ও ভাষারীতির দক্ষতায়। এই উপন্যাসের একটি মূল্যবান সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন পাওয়া যায় ককবার্নের 'মেমোয়ার্স'-এর

এই লাইন গুলিতে – Except the start of the Edinburgh Revićw,no work that has appeared in my time made such an instant and universal impression. The u*ne*xpected newness of the thing, the profusion of original characters, the *Sco*tch language, Scotch scenery, Scotch men and women, the simplicity of the writing, and the graphic force of the descriptions—all struck us with a shock of delight." এর পরই অবিশ্বাস্য ধারবাহিকতায় প্রকাশিত হতে থাকে Guy Mannering (1815). The Antiquary (1816), The Black Dwarf (1816). Old Mortality (1816), Rob Roy (1818), The Heart of Midlothian (1818). The Bride of Lammermoor (1819) এবং A Legend of Montrose (1819)। স্কটল্যান্ডের দৃশ্যপট রচিত হলেও সবগুলি রচনা গুণমানের বিচারে সমান নয় এবং সবগুলি স্কটল্যান্ডের অতীত ইতিহাস অবলম্বনে রচিতও নয়। ১৭৪৫-এর জ্যাকোবাইট (Jacobite) উত্থান এই উপন্যাস গুচ্ছের সাধারণ বিষয়। ঐতিহাসিক তথ্য বা সত্যের প্রামাণ্যতা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও স্কটের "ওয়েভারলি" উপন্যাসগুলি অসামান্য জনপ্রিয়তা অন করেছিলো। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে কটন সাফল্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক এই 'ওয়েভারলি উপন্যাসগুচ্ছ। সমালোচক প্যাট্রিক ক্রাটওয়েলের ভাষায়—'Those Novels gave something genuinely new : no earlier work had vitalized history in quite their way or with their - effectiveness.'

আগেই বলেছি "ওয়েভারলি উপন্যাসগুলির গুণমানের তারতম্য ছিলো। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে দ্য *হার্ট* অব মিড*লোথিয়ান*-এর নাম করা হয়ে থাকে। রোমান্সধর্মী এই ট্র্যাজিক উপন্যাসের মুখ্য আকর্ষণ জিনি ডিন্সের চরিত্রে স্কট জাতীয় চরিত্রের মহৎ গুণগুলিকে মূর্ত করে তুলেছিলেন। এডিনবার্গের টলবুথ রাগারের নামানুসারে এ-উপন্যাসের নামকরণ হয়েছিলো। ১৭৩৬-এর পোর্টিয়াস-দাঙ্গার ঘটনা দিয়ে এ কাহিনির শুরু। উইলসন নামে এক দস্যুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে নগর রক্ষীবাহিনীর প্রধান পোর্টিয়াস বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ করে। বিচারে পোর্টিয়াস ছাড়া পেলেও উইলসনের সঙ্গী রবার্টসন ও তার অনুচরেরা কারাগারে আঘাত হানে। পোর্টিয়াস নিহত হয়। কারারুদ্ধ এফি ডিন্স—জিনি ডিন্সের বোন ও রবার্টসনের প্রেমিকা-- শিশু হত্যার দায়ে

অভিযুক্ত হয় ও বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। জিনি তার বোনের প্রাণ ভিক্ষা করাতে লন্ডনে রানি ক্যারোলাইনের শরণাপন্ন হয় এবং তার সারল্য ও সততায় সন্তুষ্ট রানি মৃত্যুদণ্ড রদ করেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আশ্রয়ে ও বাস্তবতার পটভূমিতে এ কাহিনি লেখা হলেও স্কট নিছক ইতিহাসের বাস্তবসম্মত চিত্রণে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি মানুষের চরিত্র ও মানবিক সম্পর্কের ওপর ইতিহাসের প্রভাব দেখাতে চেয়েছিলেন।

গাই ম্যানারিং এবং রব রয় উপন্যাস দ্বয়-ও পাঠকমহলে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। *গাই ম্যানারি*-এর নাম-চরিত্র এডওয়ার্ড ওয়েভারলির মতো জনৈক ইংরেজ সমরনায়ক, যে হটল্যান্ডে এসে তার আকর্ষণে বাঁধা পড়ে। কাহিনির মূল চরিত্র অবশ্য হ্যারি বাট্রাম মে ম্যানারিং এর প্রিয়পাত্র ও তার কন্যা জুলিয়ার প্রণয়ী। এক ভুল বোঝাবুঝি থেকে ম্যানারিং ও হ্যারির বৈরিতা ও বিছো এবং তারপর নানা ঘটনা ও চক্রান্তের জাল কেটে হ্যারি ও ম্যানারিং-এর পুনমিলিত হওয়া, হ্যারি-জুলিয়ার বিবাহে কাহিনির সুখকর পরিণতি। 'রব রয়' অষ্টাদশ শতকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লেখা ; এক অর্থে 'ওয়েভারলি'-র পুনর্লিখন। রব রয়-এ-উপন্যাসে একদিকে এক কঠোর হৃদয় জ্যাকোবাইট রাজদ্রোহী, অন্যদিকে পীড়িত মানুষদের সমব্যথী। লোভী ও চতুর রাশলে কর্তৃক নসিস ও ডায়নার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ব রয়ের হাতে ব্যাশলের মৃত্যু এ-উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তের চরম বিন্দু। এর পাশাপাশি আবার ছিলো *দি ব্ল্যাক* ডোয়ার্ফ-এর মতো দুর্বল উপন্যাস। এই পর্বের কতকগুলি রচনা 'Tales of My Landlord' শিরোনামে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিলো।

'Tales of My Landlord' শিরোনামের তৃতীয় পর্যায়ের অন্যতম রচনা '*The Bride of Lammermoor*' স্কটের অনাতম জনপ্রিয় উপন্যাস। প্রেম ও হিংসার এই করুণ কাহিনি। অবলম্বনে ডনিজেত্তি প্রণয়ন করেছিলেন তার অপেরা *Lucia di Lammermoor* (1835)। রাভেনসউড প্রণয়াসক্ত হন লসি অ্যাশটন-এর প্রতি কিন্তু প্রণয়ীযুগলের মিলনের পথে অন্তরায় তাদের দুই পরিবারের বংশানুক্রমিক শত্রুতা। লুসি-র মা লুসিকে অন্যত্র পাত্রস্থ করেন লুসিকে ভুল বুঝিয়ে যে রাভেনসউড প্রেমে

অনুগত নয়। অতঃপর রাভেনসউড প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আসে। লুসি হারায় মানসিক ভারসাম্য। সে খুন করে তার স্বামীকে। রাভেনসউড ঘোড়া ছুটিয়ে যায় লুসির ভাই ও স্বামীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়তে। চোরাবালি গ্রাস করে উদ্বেলচিত্ত, যন্ত্রণাদগ্ধ ট্রাজিক নায়কের লক্ষণমণ্ডিত রাভেন্সউডকে। নিয়তি-তাড়িত এই প্রেমকাহিনিতে শেক্সপীয়ারের অমর ট্যাজেডি *রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট*-এর ছায়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রেম ও হৃদয়বাসনাকে স্কট বরাবরই দেখেছেন রোমান্সের কাঠামোয়। এ-উপন্যাসে তাতে যুক্ত হয়েছে গথিক তথা অতিপ্রাকৃত উপাদান। ভাষ্যকার বেকার স্কটের এই উপন্যাসকে বলেছেন 'the masterpiece of Gothic fiction which so many had been trying to write and never succeeding.' | স্কটের ১৮১৯-এ প্রকাশিত আই*ভান হো (Ivanhoe*) ঐতিহাসিক উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করেছিলো। স্কটল্যান্ডের ইতিহাস ছেড়ে এই উপন্যাসে স্কট দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন মধ্যযুগীয় ইংলন্ডে। আইভা*ন হো*-র ঘটনাস্থল ইংল্যান্ড ; সময়কাল সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের রাজত্বকাল, ইউরোপীয় ধর্মযুদ্ধের (Crusade) যুগ। আইভ্যান হো তার বাবা সেড্রিকের আশ্রিতা রাওয়েনার প্রতি প্রণয়াসক্ত। কিন্তু সেড্রিক রাজা অ্যালফ্রেডের বংশজাত বলে রাওয়েনাকে স্যাকসন রাজ পরিবারের কারুর সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। ছেলের অভিপ্রায় জানতে পেরে আইভানহোকে নির্বাসিত করেন সেড্রিক এবং আইভানহো অতঃপর রাজা রিচার্ডের ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয়। আইভানহাের সাহায্যে জন ও অন্যান্য শত্রুবর্গকে পরাস্ত করেন রিচার্ড এবং যুদ্ধে আহত আইভানহো ইহুদি আইজাক-দুহিতা রেবেকার সেবাযত্নে সুস্থ হয়ে ওঠে। রেবেকা আইভানহোকে ভালবেসে ফেলে, যদিও শেষ পর্যন্ত রেবেকার প্রেম পূর্ণতা পায় না। আইভানহোর সঙ্গে রাওয়েনারই মিলন ঘটে শুভ পরিণয়ে। আইভান হো-র বীরত্বের পাশাপাশি এই উপন্যাসের ত্রিমুখী প্রণয়-সম্পর্কের জটিলতা (আইভানহো, রেবেকা ও রাওয়েনা-র প্রণয় ত্রিভুজ) পাঠকদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। এছাড়া এই উপন্যাসের গঠনকৌশল ও চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা ও বিশেষ প্রশংসনীয়। মধ্যযুগের ইতিহাস, তৎসহ অতিকথা ও রোমান্সের সার্থক মিশ্রণে এক সজীব ও চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচনা করেছিলেন স্কট। নরম্যান-বিজয়ের পরবর্তী দ্বাদশ শতকের ইংল্যান্ডের জীবনের নানা দিক—দুর্গ, দরবার, নগর, ধর্মীয়

সঙঘ এবং অশ্বযুদ্ধ ও সমরাভিযান অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন স্কট আলোচ্য উপন্যাসে। যদিও দ্বাদশ শতকে স্যাক্সন নরম্যান সংঘাতের বিবরণ 'anachronisin' দোষে দুষ্ট, প্রেম ও বীর্যবত্তার এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা তাতে একটুও ক্ষুন্ন হয়নি। এই উপন্যাসের আর এক আকর্ষণ রবিন হুড ও তার সঙ্গীরা। এ ছাড়া মহত্ত্বে ও সৌন্দর্যে রেবেকা দ্য হার্ট অব *মিডলোথিয়ান*-এর জিনি ডিন্সের সঙ্গে The Monestary (1820) এবং তাঁর শেষ ভাগ The Abbot (1820) এই দুটি উপন্যাসে স্কট ফিরে এলেন স্কটল্যান্ডের ইতিহাস বৃত্তান্তে। দি ম*নাস্টারি* রানি প্রথম এলিজাবেথের সময়কার একটি মঠের পটভূমিতে রচিত প্রেম, বীরত্ব ও দুম্বন্ধের কাহিনি । আর দা আট-এর প্রধান আকর্ষণ স্কটল্যান্ডের রানি মেরির চরিত্র ও মেরির বন্দিত্বই এই উপন্যাসের বিষয়।

কেনিলয়ার্থ (১৮২০) উপন্যাসে ইংলন্ডের ইতিহাসের অন্যতম মর্মস্পর্শী কাহিনি—স্যার জন রসার্টের সুন্দরী কন্যা অ্যামির দুর্ভাগ্যের তথা করুণ পরিণতির কাহিনি পরিবেশন করলেন স্কট। রানি এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র লিটারের আর্লের সঙ্গে গাোপনে স্যামির বিয়ের ব্যবস্থা করলেন খলস্বভাব রিচার্ড ভানি। এই ভানির চক্রান্তে অবশেষে অ্যামিকে হত্যা করা হলো। ট্র্যাজিক নিয়তির অনিবার্যতা-নির্ভর এই উপন্যাসে লিস্টারের আর্ল, অ্যালকেমিস অ্যাসকোলা ও তার রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে স্কটের অতিপ্রাকৃত বিষয়ে আগ্রহের সন্ধান মেলে। এই উপন্যাসে রানি এলিজাবেথের কোর্টের খণ্ডচিত্রগুলি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সহজেই। ১৫৬০-এ রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিলো অ্যামি-র। এলিজাবেথীয় ইংলন্ডের প্রেক্ষাপটে লিখিত এই উপন্যাসে সেই ট্র্যাজিক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গই স্কটের বিষয়। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় একের পর এক উপন্যাস লিখেছিলেন স্কট। কালানুক্রমিকভাবে নাম করা যায় দি *পাইরেট (The Pirate,* 1822) *দি ফরচুনস অব নাইজেল (Fortunes of Nigel,* 1822), পেভে*রিল* অ*ব দি পীক (Perveril of the Peak*, 1423), কোয়ে*ন্টি ডাওার্ড (Penti Darward,* 1823), সে*ন্ট রোমান্স ওয়েল (St. RoydQa* 's W*ell,* 1824) রেড*গন্টলেট* (Redgauntlet, 1824) দি *বিট্রোড (The Betrot/ned,* 1825) এবং দি *টালিসম্যান ('The Talissan,*

1825)। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এক ঘোর আর্থিক সংঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো স্কটকে যার দায়ভার তাকে আমৃত্যু বহন করতে হয়েছিলো বলা যায়। জেমস ব্যালানটাইন নামক জনৈক মুদ্রণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে অংশীদারির ব্যাবসায় গিয়ে ফটকে শেষ পর্যন্ত বিপুল ঋণের বোঝা নিতে হয়। তবু তার সমস্ত প্রাণশক্তি নিঃশেষ করেও স্কট পরপর লিখলেন উডস্টক (*JWoodstock*, 1826), *দি ফেয়ার* মেইড অব পা*র্থ (The Fair Maid of Part/i,* ৭০-l828), অ্যা*ন অব গীয়ারস্টেইন (Anne of Geirstei*n, 1829), কাউন্ট রবা*ট অব প্যারিস* (*Count Robert of Paris,* 1832) এবং কা*ল ডেঞ্জারাস (Castle Dangero*us, 1832)। মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য স্কটের জীবনাবসান হয় ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বর নাসে।

১৮২১-এর গ্রীষ্মে হিব্রাইডস্ ভ্রমণকালে স্কট যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন দি পাই*রেট* উপন্যাসের ঝ*ঞ্ঝা* ও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বন্ধুর দৃশ্যপটে তার পুননির্মাণ লক্ষ করার মতো। দূরবর্তী জেটল্যান্ড (Zetland) ও সমুদ্রের পটভূমিতে প্রেম, বৈরিতা ও দ্বন্দ্বের এক মিলনাত্মক উপন্যাস *দি পাইরেট*। *দি ফরচুনস অব নাইজেল* ভাগ্যতাড়িত যুবক নাইজেল ওলিফন্টের ভাগ্যান্বেষণের কাহিনি। চরিত্র-চিত্রণে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন স্কুট এই উপন্যাসে। বিশেষ করে প্রথম জেমস (*J*arnes)-এর চরিত্রটি ঐতিহাসিক চরিত্রায়ণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজা দ্বিতীয় চার্লস *(*Charles II)-এর আমলের এক ধর্মীয় সংঘাত নিয়ে অনুট লিখেছিলেন পেভেরিল অব দি শীক। ডার্বিশায়ার-নিবাসী রাজতন্ত্রী সার জেও ফ্রি পেভেরিল ও তার প্রতিবেশী পিউরিটান মেজর ব্রিজনর্থের ঝগড়া নিয়ে রচিত হয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনি, আর সেই কাহিনির পশ্চাদপটে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ১৬৭৮-এর সেই ধর্মীয় তথা রাজনৈতিত্ব ষড়যন্ত্র যা ইংলন্ডের ইতিহাসে "Popishi Plot" নামে চিহ্নিত। দ্বিতীয় চার্লস, লর্ড বাকিংহাম, টাইটাস ওটিস প্রভৃতি স্মরণীয় ঐতিহাসিক চরিত্র এ উপন্যাসের বিশেষ আকর্ষণ। কোয়ান্টিন ডারওয়ার্ডের প্রধান চরিত্র ফরাসি রাজা একাদশ লুই ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী বার্গান্ডির ডিউক চার্লস দি বোল্ড (Charles the Bold)।

স্কটের রচনার কিছু প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য

(১) অতীতের পুনর্জীবন : গল্প বলার সহজাত ক্ষমতা এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন স্কট। কৈশোরকাল থেকেই প্রাচীন ইতিহাস, লাোকগাথা, কিংবদন্তীতে ছিলো তার অসীম আগ্রহ। এভাবেই স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড তথা মহাদেশীয় ইতিহাসের যুদ্ধ-বিগ্রহ, শৌর্যবীর্যের নানা কাহিনি এবং হদ-কানন, গিরি-প্রান্তর, প্রসাদ-পরিখার বিচিত্র চিত্র স্থান পেয়েছে। তাঁর রচনায়। মধ্যযুগের নারী-পুরুষদের জীবনবৃত্তান্ত লাভ করেছে এক অবিশ্বাস্য সজীবতা, এক পুনর্জীবন। এত অতীতচারী রোমান্টিক কল্পনাই হয়তো তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের মতো এক যুগক্রান্তির বিরোধিতায় উৎসাহিত করেছে। স্কটের পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ছিলো নিষ্প্রাণ ; তাতে প্রাণস্পন্দন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন স্কট। ড্যানি ডিনমন্ট, জিনি ডিন্সের মত নারী-পুরুষেরা অতীত ইতিহাসের পাতা থেকে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে এসেছিলো।

স্কটের উপন্যাস যেন তাঁর সমকালীন বাস্তবতার শরিক হয়ে অতীত ইতিহাস, বিশেষত মধ্যযুগের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে স্পটন-রিকেট স্কটের প্রশংসায় মূল্যবান মন্তব্য করেছেন "He is a kind of medieval reporter, fancifully detailing the spectacular effects **of the time, and concer**ned chiefly with the co our, the variety, the bustling vigour of medieval times"

(২) নিসর্গ প্রীতি না ধরণীপ্রেম : প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অতীতের ভগ্নস্তুপ ইত্যাদির মনোহর রূপ স্কটকে সর্বদাই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলির মত অতীন্দ্রিয় অনুভব নয়, স্কটের নিসর্গপ্রীতি আসলে পৃথিবীর অপার সৌন্দর্যজগতের প্রতি এক সহজ ও আন্তরিক শিশুসুলভ অনুরাগ। প্রাচীন দুর্গ, যুদ্ধক্ষেত্র, রুক্ষ-বন্ধুর পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি তাকে স্বচ্ছন্দে বশ করেছে। 'Show me an old castle and a field of battle, and I am at home at once'—বলেছিলেন স্কট। রাোমান্সের কল্পকাহিনিকে স্কট সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট ভৌগাোলিক বাস্তবতায় চিহ্নিত করেছেন ; স্থান-কাল-পাত্রের প্রত্যক্ষতায় অতীতকে করে তুলেছেন। বাস্তব অবয়বে সুনির্দিষ্ট। নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক কোন গভীর ভাব-উপাদান স্কটের রচনায় নেই। নিছক

প্রকৃতিপ্রেম বা উপাসনা নয়, স্কট প্রকৃতপক্ষে সজীব ও সুন্দর ধরণীরই অকৃত্রিম প্রেমিক।

(৩) মানবিক বোধ : স্কট যে বিশেষ গুণটির দ্বারা বিভিন্ন দেশ ও কালের বহুবিচিত্র ইতিহাসকে গতিময় ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন সেটি তার সহজ মানবিকতার বোধ। স্কট নীতিবাগীশ ছিলেন না ; জর্জ এলিয়ট, মেরেডিথ, হার্ডির মতাে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও তার আগ্রহ ছিলাে না। তার রসবাোধেও কদাচিৎ ব্যাঙ্গের বক্রতা যুক্ত হয়েছে। সরল ও সাবলীল স্বভাবের অধিকারী এই লেখক তার মানবিক ঔদার্যে মণ্ডিত করেছেন ইতিহাসের অনেক স্কুল ও বর্বরাোচিত ঘটনা তথা চরিত্রকে। স্কুটের রচনার এই সাবলীল মানবিকতা বিষয়ে বায়রন বিশেষ মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন—

Walter Scott is as nearly a throughly good man as a man can be, because, I know it by experience to be the case.

(৪) ইতিহাসের ব্যবহার : মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বেশ কয়েক শতাব্দীর ইংলন্ড, স্কটল্যান্ড এবং ইওরোপের ইতিহাসের এক সুবিশাল পরিসর থেকে স্কট আহরণ করেছেন ঘটনা ও চরিত্র। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ঘটনা বা তার পরম্পরাকে বদলেছেন স্কট ; মিশিয়েছেন বাস্তব আর কল্পনাকে। ইতিহাস সম্পর্কে স্কটের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান ছিলো অগাধ ; কিন্তু কাহিনি ও চরিত্রের চাহিদামতো তাকে ইতিহাসের তথ্যকে পরিমার্জন করতে হয়েছে। এতে করে বরঞ্চ তার চরিত্রসমূহ অনেক সজীবতা অর্জন করেছে। স্কট অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোনাে ভেদরেখা টানেন নি। বর্তমানকেই তিনি প্রক্ষেপ করেছেন অতীতের ইতিবৃত্তে। তার উপন্যাসগুলিতে ঐতিহাসিক চরিত্রেরা অনেক বেশি সক্রিয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পঞ্চদশ শতকের পটভূমিতে রচিত *Ouentin Durward* উপন্যাসে রাজা একাদশ লুইয়ের থেকে যুবক কোয়েন্টিনের ভাগ্যের টানাপাোড়েন আমাদের অনেক বেশি আকৃষ্ট করে।

(৫) গদ্যশৈলীঃ স্কটের গদ্য তেমন সাবলীল নয় ঠিকই, কিন্তু তা শক্তিশালী ও যথাযথ। এছাড়া স্কটল্যান্ডের ভাষা ও উপভাষার ব্যবহারে স্কট সজীব ও স্বাভাবিক।

কাডি হেড়িগ কিংবা জিনি ডিনসের মতো চরিত্রগুলির মুখে এক প্রাণবন্ত ভাষার যোগান দিয়েছেন স্কট।

১১.২ চার্লস ল্যাম্ব

রোমান্টিক যুগের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, ব্যক্তিগত ও আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা চার্লস ল্যাম্ব সম্বন্ধে ডব্লু, জে, লঙ-এর মন্তব্য দিয়ে শুরু করি । "0f all our English essayists, he is the most loveble, partly because of his delicate, old-fashioned style and humour, but more because of that cheery and heroic struggle against misfortune which shines like a subdued light in all his writings." ১৭৭৫এ লন্ডনে জন্ম হয়েছিলো চার্লসের। বাবা জন ল্যাম্ব ছিলেন ইনার টেম্পল বেঞ্চার স্যামুয়েল সন্টের ব্যক্তিগত করণিক। মা এলিজাবেথ হার্টফোর্ডশায়ারের জনৈকা হাউস কিপারের কন্যা।

১৭৮২ থেকে ১৭৮৯ বালক চার্লস ক্রাইসটস হসপিটালে পড়াশোনা করেছিলেন এবং সেখানেই কোলরিজের সঙ্গে তার দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সুত্রপাত। চালর্স ছিলেন নির্মাতাপ্রিয়, শান্ত স্বভাবের বালক। সাধারণ মেধা ও কথা বলার ব্যাপারে কিছু দুর্বলতার কারণে পঠন-পাঠনে বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব হয় নি চার্লসের। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সাউথ সি হাউসে ও পরে ইন্ডিয়া হাউসে করণিকের পেশায় যোগদান করেন চার্লস ল্যাম্ব। সেই থেকে ছত্রিশ বছর এই পেশায় তাকে নিযুক্ত থাকতে হয়েছিলো। স্বল্প আয়ের এই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর কর্মজীবন তার সব দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও ল্যাম্বের কাছে ছিলো তার ব্যক্তিগত প্রবন্ধাবলীর উপকরণ-ভাণ্ডার।

ল্যাম্বের পারিবারিক জীবন ছিলো বিশেষ বেদনা ও হতাশার জীবন। অসুস্থতা ও উন্মাদনা ছিলো পারিবারিক অভিশাপের মতো। বাবার স্মৃতিলাপ, মায়ের পঙ্গুলশা ও বোন মেরির উন্মাদরোগ তার পারিবারিক জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছিল। ১৭৯৬-এর সেপ্টেম্বরে মেরি ছুরির আঘাতে মাকে হত্যা করে ও আহত করে বাবাকে। সেই

থেকে মেরির যাবতীয় তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তায় চার্লসের ওপর। সে কারণে দীর্ঘ সাত বছর প্রনয় পর্বের পরেও চার্লস অবিবাহিত থেকে যান বোন মেরির সঙ্গী হিসেবে। ১৮২৫-এ কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে জীবনের শেষ দশটি বছর ল্যাম্ব কাটান কলমপেশার দায় পিছনে ফেলে। ১৮৩৪-এ মৃত্যু হয়েছিল ল্যাম্বের।

ল্যাম্ব তার সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। ১৭৯৮-এ প্রকাশিত হয়েছিলো মুক্ত ছন্দে লেখা "The Old Familiar Faces'–এক পীড়িত আত্মার বেদনার বৃত্তান্ত। ১৮০৩-এ "To Hester' শিরোনামে এক মধুর ও আবেগময় ব্যালাড। তার অন্যান্য কবিতার মধ্যে উলেখযোগ্য অপূর্ণ প্রেমের কাহিনি "Prince Dories" এর "On an Infant Dying as soon as Born" ও "She is Going". কবি হিসেবে ল্যাম্ব এর - কৃতিত্ব হয়ত তেমন উল্লেখের, দাবি রাখে না, তবু এ-বিষয়ে সেইন্টসবেরির অভিমত স্মর্তব্য 'Lamb's poems have occasionally an exquisite pathos and more frequently a pleasant humour, but they would not by themselves justify a very high estimate of him.'

এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের ভাষা ও রীতিতে ল্যাম্ব রচনা করেছিলেন *John Woodvil* (1802) শীর্ষক একটি ট্র্যাজেডি যাকে সাদি বর্ননা করেছিলেন— 'delightful poetry badly put together, an exquisite picture in a clumsy frame', এই ভাষায়। এ-নাটক মঞ্চ সাফল্য পায় নি। ১৮০৬-এ প্রকাশিত হয়েছিলো একটি প্রহসনধর্মী নাটক M*r.H , or Beware a Bad Nam*e গদ্য মাধ্যমে রচিত The Paunbroker's Daughter *ও ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা* The wife's Trial ল্যাম্বের নাট্য রচনার আরও দুটি উদাহণ।

বোন মেরীর সঙ্গে যৌথভাবে রচিত ল্যাম্বের *Tales From Shakespeare* (1807) আজও ছোট-বড় সকলের কাছে বিশেষ সমাদৃত। শেকসপীয়ারের একুশখানি নাটকের কাহিনির সংকলন এই গ্রন্থের বেশিরভাগটাই অবশ্য মেরির কলমে রচিত। ১৮০৮-এ প্রকাশিত হয়েছিলো একটি মূল্যবান সংস্করণ 'S*pecimens of English. Dramatic Poets, Who lived About the time of Shakespea*re,' বিভিন্ন স্বাদের

এলিজাবেথীয় নাটকের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ও সেই সব দৃশ্যের মূল্যায়নে সংকলক ও সমালোচক হিসেবে ল্যাম্বের অন্তদৃষ্টি ও বিবেচনাবোধের পরিচয় বহন করে। ১৭৯৮-এ প্রকাশিত গদ্য-রোমান্স A *Tale of Rosamund Gray and Old Blind Margaret* কাহিনিকার রূপে ল্যাম্বের সংবেদনশীল হৃদয়টি চিনিয়ে দিয়েছিলো। *Tales From Shakespear*-এ ছোটদের জন্য শেক্সপীয়ারের গল্প বলার মধ্য দিয়ে ল্যাম্বের সেই পরিচয় আরো জনপ্রিয়তা অর্জন করে। চ্যাপমানের হোমার—অনুবাদকে ভিত্তি করে। ছোটদের জন্য লেখা T*he Adventures of Ulysses* (1808) কাহিনি-রচয়িতা ল্যাম্বের আর এক উল্লেখনীয় প্রচেষ্টা। ১৮০৯-এ প্রকাশিত হয়েছিলো মেরি ও চার্লস ল্যাম্বের যৌথভাবে গ্রন্থবদ্ধ দশটি গল্পের সংগ্রহ Mrs*. Leicester's School, or, the History of Several Young Ladies Related by Themselves* | ১৮১০ থেকে ১৮২০-র মধ্যে কিছু সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিলো ল্যাম্বের সমালোচনা মুলক কয়েকটি প্রবা—"On the character and genius of Hogarth', "On the Tragedies of Shakespeare" ইত্যাদি। তবে যে ব্যক্তিত, মরমি প্রবন্ধের জন্য ল্যাম্বের খ্যাতি, তার সূচনা হয়েছিলাে ১৮২০-তে, "The Londori Magazine-এ | "Elia" নামের আড়াল থেকে প্রোল চার্লস ল্যান্ত হাসি-অশর অনবদ্য সংমিশ্রণে, আন্তরিত্র ও আবেগময় সুরে এই প্রবন্ধ পুলি লিখেছিলেন ১৮৯০ থেকে ১৮২ত পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়ের এই আত্মজৈবনিক প্রবল তুলি হুদা হয়েছিলো EssTI *of Elia* (1823) শিরোনামে। দশ বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হ*লো The Last Essays of Elia* (1833)। এক সহজ, আন্তরিক, সংবেদনশীল, আত্মপ্রক্ষেপণাময় গদ্যে ল্যাম্ব লিখেছিলেন ব্যক্তিগত আবেগ-অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত; পাঠকের সঙ্গে নিবিড় সখ্যে, বাস্তব ও কল্পনার চমকপ্রদ মিশ্রণে, বেদনা ও কৌতুকের মরমি দোটানায়, এক অনন্য গদ্যশৈলীতে লাল প্রলয়ের পর প্রবন্ধে উন্মোচিত বলেছিলেন এক বিচিত্র মানবভুবন। তার ব্যক্তিত্বের মাধুর্য এমনভাবে সারিত হয়েছিলাে তার প্রানিত আত্মজৈবনিক প্রবালীর পাতায় পাতায় যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্বীকার করেছিলেন, "Oh, he was good if ever a good man lived" : বন্ধু কোলরিজ তাকে উল্লেখ করেছিলেন "Gentle-hearted Charles' বলে।

প্রবন্ধকার চার্লস ল্যাম্ব

১২৮০-র অগাস্টে লন্ডন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিলাে ল্যাম্বের প্রথম প্রবন্ধ 'Recollections of the South Sea House'; তারপর অক্টোবরে ' Oxford in the Vacation' নভেম্বরে ' Christs Hospital Five and Thirty Years Ago' ডিসেম্বরে "The Two Races of Men'. প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধের জাদুতেই ল্যাম্ব জয় করেছিলেন পাঠক হৃদয়। সেই থেকে অদ্যাবধি ল্যাম্ব ইংরেজি ভাষার একন অননুকরণীয় গদ্যলেখক রূপে সমাদৃত। বিষাঙ্গণ স্বতঃস্ফূর্ততা ও বৈচিত্র্যে, রোমান্টিক ও আবেগমণ্ডিত অতীতচারিতায়, হাসি-কান্নার মরমি কার কায়ে, ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডির প্রেক্ষিতে দাড়িয়ে দেখা স্বপ্ন ও সালের খৈয়ালি বয়ান, মানবিক অনুভবের আন্তরিক সততায়, ল্যাম্ব মন্ময় তথা ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার।

ক) আত্মজৈবনিক উপাদান : রোমান্টিক শিল্পীসত্ত্বা সাধারণভাবে কম-বেশি আত্মপ্রক্ষেপময়। ল্যাম্বও ধারাবাহিকভাবে লিখে গেছেন নিজেকে আশ্রয় করে। তার নিজের বাল্যকাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ কর্মজীবন ও তা থেকে অবসরগ্রহশ তার একান্ত ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক ঘটনা ও অভিব্রতা, চারপাশের আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-স্মৃতি নিয়ে ল্যাম্ব ক্রমাগতভাবে লিখে গেছেন এক অনবদ্য, মর্মস্পর্শী আত্মজীবন ভাষ্য। জীবন ও সৃজন স্বচ্ছন্দে মিলেমিশে গেছে। তবু Elia নামের আড়াল থেকে, যেন কিছুতেই এই চরিত্রের সঙ্গে তিনি সমীকৃত হতে চান না এমন ভলিতে, তার আত্মজৈবনিক মরমি কৃথকাতাকে ল্যাম্ব দান করেছেন এক সর্বজনবেদ্য মহিমা। কোথাও ব্যক্তিগত অহমিকার প্রাবল্যে পাঠককে বিব্রত হতে হয় নি। জনৈক ভাষ্যকারের মন্তব্যে "Subjective though his essays are in the sense that they deal largely with himself and his doings, his personality did not project itself so as to bend everything within its reach into the shapes of its idiosyncrasies: it was a respective surface which reflected the ordinary life of the world, with added light and colour | ল্যান্থ্ তার পরিচিত স্মৃতিচারণার ভঙ্গিতে সাউথ সি কম্পানিতে

তার প্রথম কর্মজীবনের কন্যা লিখেছিলেন 'The South-Sea House' প্রবন্ধে। ১৭৮৯-এ স্কুলের পড়া অসমাপ্ত রেখে চোদ্দ বছরের কিশোর চার্লস ঢুকে পড়েছিলেন ঐ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মবৃত্তে যেখানে কর্মরত ছিলেন দাদা জন। অত্যন্ত আন্তরিক ভাষা ও ভঙ্গিতে এই প্রবন্ধে ল্যাম্ব চিত্রিত করেছেন তার কর্মস্থল ও সহকর্মীদের। স্মৃতিমেদুরতার সঙ্গে কোথাও কোথাও মিশেছে ব্যঙ্গ-পরিহাস। কর্মস্থল থেকে স্বেচ্ছাঅবসর নেওয়া এক প্রবীণ করণিকের আত্মকথনের মতো করে লেখা "The Superauntiated Man'-এও ছেড়ে আসা দপ্তরের সহকর্মীদের প্রতি যুগপৎ পরিহাস ও সহানুভূতি এবং দীর্ঘ কর্মজীবনের নানা ঘটনা নিয়ে কৌতুক ও শঙ্কা প্রবন্ধকারের আত্মজৈবনিক সুখ-দুঃখের আপাততুচ্ছ, ইতিবৃত্তকে এক বৃহত্তর জীবনবোধে উত্তীর্ণ করে দেয় "Christ's Hospital Five and Thirty Years Ago' শীর্ষক প্রবন্ধে কল্প-কথক Elia শুনিয়েছেন ১৭৮২ থেকে ১৭৮৯ Christ's Hospital'-এ কোলরিজের সহপাঠী বালক চার্লসের স্কুল-জীবনের নানা ঘটনা ও প্রসঙ্গ। চার্লসের বন্ধু ও শিক্ষকবর্গ, তার মানসিক উদ্বেগ-অস্থিরতা-বিষন্নতা, শ্রেণিকক্ষের ভেতরে-বাইরে নানাবিধ তৎপরতা, এসব কিছু নিয়ে, পরিহাস ও বেদনাকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মিশিয়ে আত্মজীবনীকে বড়ো আন্তরিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধের পাতায় পাতায় ।

আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুবর্গের নানা ঘটনা ও প্রসঙ্গ স্মৃতিবাহিত আখ্যানবদ্ধ হয়ে কখনো রসসিক্ত, আবার কখনো বা মেদুর করে তুলেছে ল্যাম্বের আত্মপ্রক্ষেপময় প্রবন্ধের পৃষ্ঠাগুলিকে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'My Relations", "Dream Children A Reverie", The Old Benchers of the Inner Temple'-এর মতো অনেক রচনা। 'My Relations'-এ তার পরিবারের দুই পরিচিত মুখচ্ছবি, Aunt Hetty ও দাদা John, স্পষ্ট হয়েছে চরিত্র-চিত্রণের সহজ সাবলীলতায়। James ও Bridget Elia নাম দুটির আড়ালে ল্যাম্বের মুখচ্ছদ Elia লুকিয়ে রেখেছেন ল্যাম্বের দুই প্রিয় মুখ—দাদা জন ও দিদি মেরি। "Dream Children : A Reverie' শিরোনামের অনবদ্য আহাজৈবনিক প্রবন্ধে একইভাবে ল্যাম্বের প্রেমিকা, যার সঙ্গে লেখকের দীর্ঘ হৃদয় বিনিময় কোনো স্থায়ী সম্পর্কের রূপ পায় নি, দেখা দিয়ে যান Alice W—

নামের আড়ালে। পারিবারিক দুর্বিপাকে চিরকুমার ল্যাম্বের bachelor arm-chair'-এর পাশে বসে থাকা “Faithful Bridget'-এর উল্লেখে বোঝা যায় গভীর বেদনাকে সযত্নে লুকিয়ে রেখে লেখক খেলাচ্ছলে ইশারা করতে চাইছেন তার অসুস্থ “Sister Mary'-কে। এই প্রবন্ধে এক অনন্য ব্যময় গদ্যভাষায়, দুঃসহ মনোবেদনার ওপর কৌতুকপরতার গুণ্ঠন টেনে দিয়ে ল্যাম্ব শুনিয়েছেন অসম্ভব ইচছাপূরণের গল্প। তার দুই প্রিয় নারী ও পুরুষের নাম ব্যবহার করে দুই স্বপ্নসন্ততি Alice ও John-কে বলেছেন তার বাল্যকালের স্মৃতিকথা—প্রাচীন, প্রাসাদোপম Norfolk Hanse-এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা Grandmother Mrs. Field, সেই বাড়ি ও তার বিশাল বাগানে তার নির্জন সময়যাপন, দাদা জনের তৎপরতা ও অকাল মৃত্যু, Alica W—-এর সঙ্গে অসল প্রণয়বৃত্তান্ত ইত্যাদি। এক শান্ত, মরমি আবেগময়তা, এক অনুচ্চকিত অস্মিতা, এক আপাত হাস্যোজ্জল মুখের আড়ালে অপুর্ণতার বিষাদ ও অশ্রু এই প্রবন্ধকে করে তুলেছে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ থেকে স্থান-কাল-পাত্রের অতীত সর্বজনবেদ্য মর্মময় আখ্যানে। 'The Old Benchers of the Inner Temple" প্রবন্ধটিও স্মৃতিমেদুর আত্মজীবনকথার এক চমৎকার নিদর্শন। চরিত্র চিত্রণের সুতায় ও নাটকীয়তার নিপুণ মাত্রা আরোপের দক্ষতায় এই প্রবন্ধে ল্যাম্ব ফুটিয়ে তুলেছেন Thomas Coventry. Samuel Salt ও সল্টের সহকারী Lovel সহ অনেক পুরোনো চেনা মানুষদের ছবি। তার যৌবনে দিদি মেরির সঙ্গে হার্টফোর্ডশায়ারের খামার বাড়িতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে ল্যাম্ব লিখেছিলেন “Mackery End, in Hertfordshire প্রবন্ধটি। "Bridget Elia' নামের আড়ালে থাকা মেরির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্কের কথা আছে "Mrs. Battle's Opinions On Whist'-এ। তার নানা সংস্কার, দৃষ্টিভঙ্গি ও আকর্ষণের কথা ল্যাম্ব ব্যক্ত করেছেন, “Imperfect Sympathies” এবং “The Confession of a Drunkard" প্রবন্ধ দুটিতে। প্রায় প্রহসনধর্মী হাস্য-পরিহাসে তার নিজের স্বভাবের নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন "Popular Fallacies'-এ | সমাজের দরিদ্র ও পীড়িত মানুষদের প্রতি অকৃত্রিম সহানুভূতিতে লিখেছেন "The Praise of Chimney-Sweepers'.

এইভাবে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে রোমান্টিক কল্পনা, স্মৃতিমেদুরতা, কাব্যমণ্ডিত আবেগময় ভাষা ও স্বগতকথনের নির্দেশক সর্বনামটিকে ব্যবহার করে ল্যাম্ব ইংরেজি সাহিত্য প্রবন্ধ শিল্পাকে এক অদ্বিতীয় মন্ময়তার মাত্রা দিয়ে গেছেন। মধ্য-চল্লিশে একজন লোক কিভাবে তার শৈশব ও বিদ্যালয়জীবন থেকে শুরু কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন, শিল্প-সাহিত্য-সংহতির রুচি, মন ও মননের অজস্র সম্পদ শব্দবন্দি করে গেলেন একের পর এক প্রবন্ধে তা সত্যিই বিস্ময়কর। ধারাবাহিকভাবে ও চূড়ান্তভাবে আত্মজৈবনিক প্রবন্ধ রচনা করে গেলেও কোথাও কোনো আত্মপ্রচার বা মতামত জাহির করার প্রয়াস চোখে পড়ে না। বাস্তবতা ও করনা ব্যক্তিত্বের শান্ত মাধুর্যে মিলে মিশে গিয়ে তার প্রবন্ধ এমন এক বিশদ ও বিচিত্র মানবভুবন আমাদের কাছে মেলে ধরে যে আমরা ব্যক্তিজীবনের আয়নায় দেখতে পাই, "চেনা দুঃখ, চেনা সুখ, চেনা চেনা হাসিমুখ, চেনা আলো, চেনা অন্ধকার।" বর্তমান অনুচ্ছেদ শেষ করছি একটি সারবান অভিমত দিয়ে-' To himself, he was one of a crowd, sympathizing with its most ordinary pleasure and sorrows. His natural humility precluded any consciousness of a mission to teach : he had not even the ambition to formulate a philosophy of life..... he had learnt the lesson of self-effacment and that sanity of outlook which defends its possessor from thic misfotunate of taking himself too seriously.'

খ) বেদনা ও কৌতুকের সহাবান ও সংমিশ্রণ : সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা কম্পটন রিকেট ল্যাম্বের পরিহাসপ্রিয়তাকে বলেছেন 'rainbow humour গভীর অন্তদৃষ্টি ও সহানুভূতি ল্যাম্বের রচনায় হাস্য-পরিহাসের এমন এক বহু বর্ণময় চমৎকারিত্বে পাঠককে মাোহিত করে রাখে যে অনেক সাধারণ ও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের গল্প অসামান্য সংবেদনশীলতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। শেলির অবিস্মরণীয় উক্তি, 'Our Sweetest songs are those that tell of sadest thought ল্যাম্বের প্রবন্ধে প্রতিক্ষণে সত্য হয়ে ওঠে যখন শব্দ-প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ-পরিস্থিতির আপাত কৌতুকের আড়ালে আমরা টের পাই কিভাবে তিনি লুকিয়ে রাখছেন হৃদয়ভঙ্গের

বেদনা। কিভাবে অশ্রুপাতের পূর্ব মুহূর্তে অত কৌতুকে তিনি বিষাদ-বেদনা জনিত আতিশয্যের সম্ভাবনাকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। "Dream Children প্রবন্ধে দাদা জনের মৃত্যুর স্মৃতি যেভাবে উল্লেখ করেছেন কিংবা সাংসারিক চাপে দাম্পত্যজীবনের অভিজ্ঞতায় বঞ্চিত মানুষটি যেভাবে বেদনাঘন কৌতুকে বলেছেন তার ‘bachelor arm chair'-এর কথা তাতে ল্যাম্বের এই দুঃখ পরিহাসের যুগলবন্দি পাঠকের হৃদয়-তন্ত্রীতে নির্ভুল 'ঘা দিয়ে যায়।

ল্যাম্বের হাস্য-পরিহাসের সূন্ন বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কনো রসিকতাপূর্ণ অতিকথনের ঝোকে এক শানিত কৌতুক খেলা করে যায়, যেমন, Poor Relations' প্রবন্ধের প্রারম্ভিক পংক্তিগুলিতে, পর পর অনেকগুলি অদ্ভুত তুলনার সচেতন আতিশIে A pOOT relation-is the most irrelevant thing in nature,-a piece of impertinent correspondency-an odious approximation, a haunting conscience. preposterous shadow, lengthening in the moontide of our prosperity, an | unwelcome remembrances..." এইভাবে চলতে থাকা বারো পংক্তির প্রথম অনুচ্ছেদ। অথচ প্রবন্ধটি শেষ হয় বেদনার সুরে-'John Billet did not survive long.... He died at the Mint where he had long held, what he accounted, a comfortable independence, and with five pounds, fourteen shilings, and a penny....left the world, blessing god that he had enough to bury him, and that he had never been obliged to any man for a sixpence. This was a Poor Relation.' সরস কৌতুক ও কথার মাজা ছড়ি আছে ল্যাম্বের বহু প্রবন্ধে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় “All Fools এবং A Dissertation upori Roist Pig'-এর। এপ্রিলের প্রথম দিনটিতে বিশ্বের সব খ্যাতিমান বোকাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখক এমপেডোক্লিস আলেকজান্ডারের মতো ব্যক্তিদের নির্বুদ্ধিতার কথা বলেছেন ‘All Fool's Day' প্রবন্ধে। "A Dissertation upon ast Pig" নানা উদ্ভট প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্তের চমকপ্রদ রসায়নে জারিত। শ্লেষ, ব্যজস্তুতি ও কূটভ্যাসের সাহায্যে ল্যাম্ব তার

রচনা সক্ত নরন্তনা কৌতুকের কিছু জটিল ও বক্র মাত্রা। Browne ও Buston-এর মতো সপ্তদশ শতকের সূচনাপর্বের ইংরেও গদ্যকারদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উপকরণ ও রাতি সংগ্রহ করেছিলেন ল্যাম্ব । কোথাও আবার তার বঙ্গ-পরিহাস মূলত প্রনামা, যেমন "Popular Fallacies' প্রবন্ধে, কোথাও চেনা মুসকে আড়াল করে। রাখতে রহস্যজনক ও কৌতুকপূর্ণ আবরণের ব্যবহানা, যেমন, "The Supperannuated Man Fazzi Christ's Holspital'.

ল্যাণের প্রবন্ধে হাস্য-পরিহাস কখনাে তেমন উচকিত বা উদ্দাম হয়ে ওঠে না। ব্যক্তিত্বের নমনীয় স্পর্শ ও এল স্মৃতিবাহিত বিষন্নতা প্রায় সবাই তার কৌতুকপরতায় যুক্ত করে এক আশGষ মাত্র। অপর এক ইংরেজ প্রবন্ধকার হ্যাজলিলের বয়ানে— *How admirably he has sketched the former inmates of the South-Sea House : what "fine fretwork he makes of their double and single entries! With what well disguised humour he introduces us to his relations, and how freely he serves up his friends!" প্রকৃতপক্ষে লন্ডন শহরের পথ-ঘাট-জনবসতি-বাণিজ্য-সংস্কৃতি-বিনােদন, আত্মীয় পরিজন-বাগ-প্রতিবেশী ইত্যাদি সবকিছু ল্যাম্বের লেখনীতে ধরা পড়েছে তার অনবদ্য বিষ কৌতুকে। পরিহাসপ্রিয়তা ও গভীর বেদনা জারিত হাস্যোজ্জ্বলতম ল্যাম্বের জীবনদর্শনের পরিচায়ক। তার এই ভঙ্গি ল্যাম্বের জীবন ও রটনার চাবিকাঠি।

গ. বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণ : ব্যক্তিগত জীবনে তার অনেক অপূর্ণতা ছিলো, ছিলো অনেক দুঃখ-বেদনা। তার সব প্রবন্ধই ব্যক্তিগত জীবন ও অভিজ্ঞতার নানা রসদে সমৃদ্ধ। তবে ল্যাম্বের প্রবন্ধের পাঠকমাত্রেই জানেন যে তিনি কিভাবে ব্যক্তিগত জীবনের নানা টুনা ও তথ্যের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে দেন, স্থান কাল-পাত্রকে কে দেন এক কােয়ালি রহস্যময়তার মােড়ক যাতে করে একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ বিবাদ এক হননি উপভােগ্যতা অর্জন করে। ভাষার Cazamian-এর মতে "Lamb's personality is unique. The essays...becomes in his hands the artificial but precious instrument of a constant self-revelation. *The fictitious*

figures of Elia is the main but not the only centre of that secret magnetism wh*ich* o*rganizes e reflections, the memories of books and things the diversi*ty o*f opinions and characters, the comedy and dranu of each day, around one theme, manicly, the particular reaction of a soul to life. Without open*ly *taking himself as a subject, without touching upon any aspect of h*is own ex*perience but to transform it, Lamb is foreve*r *speaking of himself..... The subjectivist of his method bears no r*es*emblance to that of the great fonattal egoists: one discerns in if the sh*rowd *derachment of a critical* mind awar*e of the illusion implied in all personal preoccupation*, and infusing a spirit of irony even into the inevitable self-pity that always accompanies the contemplation of one's past. | Elia নামের আড়াল থেকে এক শিশুসুলভ খেয়ালে, এক স্বভাবসিদ্ধ বেদনাদন কৌতুকে ল্যান্ত জানালেন নানা খুটিনাটি তুলে ধরেছেন তাতে হানার রং ও রূপ আরাােপ করে। পাঠকের সঙ্গে লেখকের এ এক চমকপ্রদ লুকোচুরি খেলা । রাােমান্টিক কল্পনার ছোঁয়ায় বাস্তব

জবানের তথ্য বা fictীর সঙ্গে আখ্যান লা fiction-এর কলরম্যতাকে এমনভাবে মিশিয়ে আপাত দলকের ব্যক্তিজীবনের ভাষ্য শুরুভার হয়ে উঠতে না পারে এ বিষয়ে তার সাতত। 18 ছিল। 'Brother or sister, Inever had any to know therm', লিলেন লা ; কিন্তু। আমরা তাে জানি তার এ কথা সত্য নয়। উন্মাদিনী মেরি তার লেখায় হয়ে গেলেন ‘Cousin Bridget', Elia তার জন্মস্থান হিসেবে তিনটি জায়গার নাম উল্লেখ করলেন। 'অবিবাহিত লেখক। গল্প শাােনালেন তার দুই স্বপ্নশি জন ও অ্যালিসকে। কিভাবে খেয়ালি কল্পনা ল্যাম্বের প্রবন্ধে রূঢ় বাস্তবকে এক সূক্ষণ লাােদনামণ্ডিত রহস্যে বিধুর করে তাােলে তার দৃষ্টান্ত Dream Children প্রবন্ধের শেষাংশে পাওয়া যায়— Which stood gazing both the children grew

gradually fainter to my view, receding, and still receding, till nothing at last but two mournful feature were seen in the uttermost distance, which without speech, strongly impressed upon me the effects of speech...' 12 TIGO জীবনবৃত্তান্তের নানা ঘটনার কথা বলতে বলতে কোনাে এক খেয়ালি কল্পনা তার মনে উকি দিয়ে গেছে, তখনই ল্যাম্ব বয়ন করেছেন এক রাহসিক শব্দ তন্তুজাল। স্মরণ করা যেতে পারে। "The Superannuated Man'-এর অবসরপ্রাপ্ত করণিকের মন্তব্য—"It was like passing Out of Time into Eternity.' এখান থেকে শুরু করে ল্যাম্ব আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। সময় ও অনন্ত বিষয়ক এক দার্শনিক প্রস্তাবনা। দীর্ঘ, কিন্তু বিশেষ চিত্তাকর্ষক এই অংশের শেষে তকবিদ্যা ও গণিতের মজায় ল্যাম্ব অনুসরণ করেছেন তার অন্যতম প্রিয় গদ্যলেখক ও *Religio* M*edic*i-এর রচয়িতা টমাস ব্রাউনকে—'The remnant of my poor days whether long or short, is at least multiplied for me threefold. My ten next years, If I stretch so far, will be as long as preceding thirty. 'Tis a fare rule of three sum.' | বাস্তব ও কল্পনার এই শিল্পিত মিশ্রণ প্রাবন্ধিক ল্যাম্বের জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন। বাস্তবের দুঃখ-বেদনা-রূঢ়তা ব্যঙ্গ- কৌতুকে জারিত হয়ে, কল্পনার স্পর্শে কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে, চিরস্থায়ী শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে ল্যাম্বের প্রবন্ধে। হারফোর্ডের বক্তব্য উদ্ধার করে এই অনুচ্ছেদের আলাচনায় ইতি টানছি—lis own imagination glances off, as it were, upon the edge of humour, and becomes a glitteing spray of freaks and sallies. Hs has from first to last, a boyish delight in play.' ব, গদ্যশৈলীর স্বাতন্ত্র্য :

সমালোচক Hugh Walker-এর মতানুসারে ল্যাম্বের গদ্যরীতি ততটা আধুনিক নয় ; বরং এলিজাবেথীয় তথা সপ্তদশ শতকের গদ্যের তিন রচয়িতা রবার্ট বাটন, টমাস ব্রাউন ও টমাস কুলারের প্রভাবে ল্যাম্বের গদ্য কিছুটা সাবেকি ; ভঙ্গিপ্রধান ও খেয়ালি গদ্য—'Their thoughts were largely his, their quaintness and conceits

filled in with his humour, their antique flavour pleased his critical palate.' সপ্তদশ শতকের বিশিষ্ট গদ্যকারদের। রচনার প্রতি স্বভাবত আকৃষ্ট হলেও এবং তাদের রচনাকে গদ্যশৈলীর প্রাথমিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও ল্যাম্ব তার প্রবন্ধে এক অনন্য ও অননুকরণীয় গদ্যের নির্মাতা। ভাষ্যকার Compton-Ricket এর বিচারে ল্যাম্বের গদ্যশৈলী হলো 'ia mixture certainly of many Styles but a chemical, not a mechanical mixture.' সেই গদ্যের চলনকে Saintsbury তুলনা করেছেন প্রজাপতির ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ানোর সঙ্গে।

পূর্বসুরীদের কাছ থেকে ল্যাম্ব আহরণ করেছিলেন উপমা-অনুপ্রাস, যুগ্মশব্দ, ধ্রুপদি লাতিন শব্দবন্ধ, নামবাচক পদ, অপ্রচলিত শব্দের পশরায় সজ্জিত এক ধরনের সেকেলে, দূর-প্রসাধিত গদ্যরীতি। সেই সঙ্গে ছিলো নানা উদ্ধৃতি ও পুনরুক্তির প্রয়োগ, কখনো কখনো কিছুটা খেয়ালিপনায় চিহ্নিত। 'Arride'. 'reluct, 'indivertible', 'recognitory', 'defilations', incurebsity', scientall'-এর মতো শব্দ ছড়িয়ে আছে ল্যাম্বের প্রবন্ধাবলীতে। সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দের সারিবদ্ধ বিন্যাসে কিংবা পুনরুক্তিমূলক শব্দ/শব্দবন্ধের ব্যবহারে ল্যাম্ব তার গদ্যকে দিয়েছিলেন এক জাতীয় ভঙ্গিপ্রধান স্বাতন্ত্র্য। ধরা যাক, 'The Praise of Chimney Sweepers'-এর নমুনাগুলি, ঝুল কালি মাখা চিমনি-সাফাইকারীদের বর্ণনায় যেগুলি প্রয়োগ করেছিলেন তিনি- 'innocent blackness', 'Young Africans', 'almost clergyimps": কিংবা "A Dissertation upon Roast Pig' প্রবন্ধে অতীব সুস্বাদু মাংসের বর্ণনায় ব্যবহৃত পুনরুক্তিধর্মী অতিকথনের ভঙ্গি—an indefinable sweetness growing up to the tender blossoming of fat-fat cropped in the bud-taken in the shoot in the first innocence..

প্রাচীন ও গুরুভার লাতিনগন্ধী শব্দ যত্রতত্র খুঁজে পাওয়া যাবে ল্যাম্বের লেখায়। পাওয়া যাবে অজস্র লাতিন বাগধারা, শব্দবন্ধ, কোথাও কোথাও দুরূহ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দের প্রয়াোগে স্যামুয়েল জনসনের গদ্যরীতির কথাও মনে পড়ে যাবে আমাদের। 'Astoundment", "Firry Wilderness', 'ponderons embowelements of

lead and brass mundus edibilis', 'Opus operatum est', 'mollia tempora fandi — ইত্যাদি শব্দ বা শব্দবন্ধ পাঠকদের চমকিত এবং হয়তো কিছুটা বিব্রত করে তুলবে। জনসনীয় পণ্ডিতি গদ্যের কয়েকটি নিদর্শন এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে—a superfaetation of dirt' (The South-Sea House), reductive of juvenescent emotion' (The Old Benchers), 'Those consolatory instershices' (Oxford in the Vacation). বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে এসব কিছু গদ্যরীতির সহজ স্বাভাবিকতার পরিপন্থী। কিন্তু এই প্রাচীনত্ব, শব্দ/শব্দবন্ধের পণ্ডিতি গাম্ভীর্য ল্যাম্বের গদ্যকে এক অদ্ভুত স্বাদুতা দিয়েছে তা অনস্বীকার্য।

প্রসঙ্গ উল্লেখপ্রবণতা- ল্যাম্বের গদ্যের আর এক বৈশিষ্ট্য। এলিজাবেথীয়-জ্যাকোবীয় গদ্যলেখকদের রচনা ছাড়াও ল্যাম্ব ছিলেন বাইবেল ও ধ্রুপদি সাহিত্যের পরিশ্রমী পাঠক। সেইসব সাগ্রহ পাঠ ও অনুধাবনের চিহ্নরূপ অসংখ্য প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি ছড়িয়ে আছে ল্যাম্বের রচনায়।। কেবলমাত্র তার বিস্তৃত পাঠ্যাভাসের নমুনা হিসেবেই নয়, এইসব প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি প্রয়াোগের স্বাতন্ত্রে তার রচনাবলী স্থায়ী ও মূল্যবান সম্পদ রূপে পাঠকের স্মৃতিতে জাগ্রত হয়ে থাকে।

Oxford in the Vacation', 'Christ's Hospital', 'The Old and the New School Imaster', The Superannuated Man' প্রভৃতি প্রবন্ধে বাইবেল ও গ্রিক পুরাণের নানা চরিত্র ও প্রসঙ্গের উল্লেখ, হাোমার-ভার্জিল-মিলটন প্রমুখের রচনার প্রাসঙ্গিক উদ্ধতি /প্রতিধ্বনি ল্যাম্বের গদ্যকে এক ব্যতিক্রমী সম্পন্নতায় মণ্ডিত করে। | রাোমান্টিক স্মৃতিমেদুরতা ল্যাম্বের গদ্য শৈলীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। তার সেরা গদ্যভাষা ও ভঙ্গি অতীতচারিতার লক্ষণাক্রান্ত। মননের গভীরতায়, কল্পনার চমকে, খেয়ালিপনার মনাোরম চাতুর্যে বিচিত্র স্থান-কাল-পাত্রের স্মৃতি, পূর্বতন লেখকদের বহু রচনার উপলখণ্ড ল্যাম্বের প্রবন্ধে ভিড় করে আসে। এই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন তার রচনাবলীতে নিরন্তর বাজতে থাকা বিষাদের সুর। রাোমান্টিক সজনীসত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই বিদবেদনা (pathos) ল্যাম্বের গদ্যশৈলীর ইন্দ্রজালশক্তি যা তার বিষয় ও ভাবনাকে মানবিক মূল্যে প্রাল করে তোলে। অন্যদিকে সেই বিষাদের সঙ্গে

কমাশ্চর্যভাবে মিশে থাকে বঙ্গ-পরিহাসের বিচিত্র রূপ ও রং। কান্না হাসির দোলাচলে জল্যাম্বের "দ্য পায় অননুকরণীয় দ্বিমাত্রিকতা। নানার-ব্রাউনদের রচনারীতিকে অনুসরণ করলেও, ল্যাম্ব তাদের অনুকরণ করেন নি। উত্তমপুরুষ আখ্যান পরুতিতে, ক্রমাগত " |" ব্যবহার করে স্বণ কথানের স্বর ও ভলিতে নমো বলেছেন ল্যা; প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাঠকদের সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বের নৈকট্য বজায় রেখে ! সপ্তদশ শতকের দ্যিকারনের রচনা পাঠের স্মৃতি তাকে বারবার পূর্বসূরীদের কাছে ফিরিয়ে দিলেও ল্যার কেবলমাত্র তাদের খাদ্যের আদশে বাঁধা পড়ে থাকেন নি। বিভিটা বিষয়ের জন্য ল্যাব বেছে নিয়েছেন ব ভন্ন ধরনের ভাষা ভঙ্গি। কথনাে তিনি বার্টনের মতাে খেয়ালি-কল্পনার সওয়ার : কখনাে বেকনের মতাে উদ্দেশ্যপ্রধান ও সাড়ম্বর ; আবার কখনাে মিলটন ও জেরেনি টেনিকের মতাে উন্নত ও মহিমময়। সে কারণে বলা যায় যে ল্যাম্বের গদ্যরীতি থাহি সারাহী বা “electic",

সহজ সরল আটপৌরে গরে সাবলীল শুদ্ধতা ল্যাম্ব কিভাবে পাঠদয় জয় করে নিতে পারেন অনায়াসে তার চমৎকার নিদর্শন "Dream Childreti: A Reverie' প্রবন্ধটি। নিতান্ত আত্মজৈবনিক এই রচনায় আ জীবন অবিবাহিত ল্যাম্ব তার বাল্য ও কৈশােরের স্মৃতিকথা শুনিয়েছেন তার দুই স্বপ্ন শিশুকে। আরামকেদারায় ঘুমিয়ে পড়া ও সেই দমঘোরে স্বপ্ন দেখার ছলে লেখা এই প্রবন্ধে সমস্ত 'খ্যানটি একটি টানা তানুচ্ছেদে রচিত। উত্তম পুরুষের আত্মকথন স্মৃতিবাহিত আনন্দ-বেদনাকে 'হর্ষ-বিষাদের যুগপৎ সূক্ষ্ম বয়নে মর্মস্পশী করে তুলেছে এই মিতভাষ্যে। আন্তরিক আবেগ ও অনুভূতিময়—ইন্দ্রিয়ময় ভাষা এ প্রবন্ধকে করে তুলেছে কবিতার eife FSU S4132—Then I told how good she (Mrs. Field) was to all her grandchildren, having us to the great house in the holidays where I in particular used to spend many hours by myself in gazing upon the busts of the twelve Caesars.....till the old marble heads seem to live again. or I to be turned into marble with them; how I never could be tired witi roaming about that huge mansion, with ts vast

empty rooms with their worn out hangings, fluttering tapesty....sometimes in the spacions old-fashioned gardens, which I had almost to myself, unless when now and then a solitary gardening man would cross me-and how the nectarines and peaches hung upon the walls, withour my ever offering to pluck them, because they were forbidden fruit, unless now and then, and because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy-looking ye.. trees, or the firs, and picking up the red berries, and the fir apples..... or in lying about upon the fresh grass with all the fine garden smells around me-or basking in the orangery, till I could almost fancy myself riper ing too along with the oranges and che times in that grateful Warmth... কবিতায় চিন্তন ও অনুভব যেভাবে ইন্দ্রিয়ময় ভাষায় অতনু লাবণ্যে। আমাদের স্পর্শ করে ল্যাম্বের এই গদ্যভাষা ঠিক তেমনই। উ, সমালোচক ল্যাম্ব :

GUTEGI 'On the Genius and Character of Hogarth" 0172 44310s Hugh Walker বলেছিলেন এক গভীর উপলব্ধি ও বিরল প্রজ্ঞার উদাহরণ – enarvellous power of comprehension and interpretation which can be explained only as the fruit

of u rare wilon,' হ্যাজলিটও ল্যাম্বকে অভিহিত করেছিলেন বিশেষ রসবাোধ ও কাণ্ডজ্ঞান। সম্পন্ন মানুষ হিসেবে। এই রসবাোধ মণ্ডিত প্রজ্ঞাই সমালাোচক ল্যাম্বের প্রধান শক্তি। "The Old Tid the Naw Schoolmaster' প্রবন্ধে তার রসদাোত্তীর্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় খুব স্পষ্ট। প্রাচীন ও আধুনিক স্কুল শিক্ষকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে চমৎকার ব্যঙ্গ-পরিহাসে তিনি শিক্ষাৰ আপাত-উলা'র আবরণ সরিয়ে দেন। *Recollection of Chris't Hospital'-এ শিক্ষার পাঁচটি নীতিসূত্র তুলে ধরেন

ল্যাম্ব। অতীতের কথা বলতে গিয়ে রাোমান্টিক ভাবুকতার প্রতিনিধি ল্যাম্ব এক মর্মনিয় জীবনদৃষ্টি ব্যক্ত করেন তার Old China' প্রবন্ধে।

কোলরিঙা, হ্যাজলিট, ডি কোয়েন্সি প্রমুখের পাশাপাশি সাহিত্যসমালোচক হিসেবে ল্যাম্বের অবদান বিশেভাবে স্মরণযাোগ্য। শেক্সপীয়ার ও অন্যান্য এলিজাবেথীয় জ্যাকোবীয়। নাট্যকারদের রচনার কাব্যসৌন্দর্য আবিষ্কারে তার ছিলাে অগ্রণী ভূমিকা। এ ব্যাপারে উল্লেখ করতে হয় 'Specimens of Englisli Dramatic Poets" গ্রন্থটির। প্রায় তিরিশ জন নাট্যকারের কয়েনশি' নাটকের মধ্যে বেছে নেওয়া অংশ গুলি এবং তাদের সঙ্গে সংযাোজিত সমালাোচনা-ভা; ল্যাম্বের বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার সার্থক পরিচয় বহন করে। নাট্য-পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় , চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও নাটকের কাব্যসম্পদের মূল্যায়নে এই সংকলনে ল্যাম্ব সার্থক সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

"On the Artificial Comedy of the Last century' TOP1675 a গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার (Restoration) যুগের প্রখ্যাত নাট্যকারদের (কনগ্রিভ, ওয়াইচারলি |) কমেডি নাটক বিষয়ে রচিত এই প্রবনে, ল্যাম্ব এক মধ্যবর্তী অবস্থান বেছে নিয়েছেন—একদিকে তিনি নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত বলে সমালাোচিত কৃত্রিম কমেড়িনাটকের সমালাোচনা করেছেন, আবার অন্যদিকে এই ধরনের নাটক নাট্য-পরিস্থিতির উদ্ভট মজা ও সংলাপে শানিত ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আকর্ষণ সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন দর্শক। সাধারণের ছুতমাগকে 'Cox.combical moral sense' বনে। রেস্টোরেশন নাট্যকারদের রচনা ছাড়াও ল্যাম্ব এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন Cervantes-এ *Don Quixote*, বেকনের New *Attantis* ও *শেরিডনের* S*chool for Scandal এর।*

ল্যাম্বের অন্য দুটি রচনা '*Genius of Hogarth'* এবং '*Tragedies of Shakespeare'* এ তার সমালোচক-দৃষ্টির উদারতা ও গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির তীব্রতা টের পাওয়া যায়। হগার্থের বাস্তবতাবাোধ ও মানবতাবাোধের সমন্বয় ল্যাম্বের চোখে ধরা পড়েছিলো। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেড়িগুলিতে তিনি দেখেছিলেন কল্পনাশক্তির

ব্যতিক্রমী 'উজ্জ্বলতা ও নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-জটিলতার গভীরতা। বিতর্কিত এক সত্যকে ব্যক্ত করেছিলেন—"The plays of Shakespeare are less calculated for stage performance than those of almost any other dramatists." | সমালোচক ল্যাম্ব পছন্দ করতেন সেইসব কবি-লেখকদের যাদের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলো। যেমন, অষ্টাদশ শতকের লেখকদের সমালোচনধর্মী রচনায় এক সহজ, সংস্কারমুক্ত, আবেগময় চিন্তার ছাপ রয়েছে। সমালোচক হিসেবে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমী ও ইতিবাচক মানসিকতা ময়ুক্ত বিশেষ করে মালিত। তথা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্যের নার্যর মূল্যায়নে ল্যাম্বের দক্ষতা ছিলো ঈর্ষণীয়।

১১.৩ অনুশীলনী

১। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে ওয়াল্টার স্কটের ভূমিকা আলোচনা করো।

২।চার্লস লাম্বের প্রবন্ধ সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করো।

১১.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১।Hisory of modern criticism –Rene Wellek

২।Literary criticism: A short history-Wilmsatt.J.& books

৩।The mirror and the lamp-M.H Abrams

একক ১২ - সাহিত্যের পথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাস ক্রম

১২.১ সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

১২.২ “তথ্য ও সত্য" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী

১২.৩ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব আলোচনায় কল্পনার গুরুত্ব

১২.৪ অনুশীলনী

১২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কবিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। সাহিত্যের বিভিন্ন পথে তিনি যেমন অবাধে বিচরণ করেছেন। তেমনি চিন্তা জগতের বিভিন্ন দিকেতার গভীর মননশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতির পাশাপাশি তিনি কাব্যতত্ত্বের উপরেও সুগভীর ভাবনা-চিন্তা করেছেন এবং তিনটি গ্রন্থের মধ্যে তার যাবতীয় চিন্তাধারা ধরে রেখেছেন। এই তিনটি গ্রন্থ হল সাহিত্য(১৯০৭), সাহিত্যের পথে (১৯০৬) এবং সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩)। অবশ্য খণ্ড খণ্ড ভাবে আরো কিছু জায়গায় সাহিত্য সম্পর্কে তার মূল্যবান অভিমতের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

সাহিত্য তথা কাব্য সম্পর্কে প্রথম আলাে্চনার সূত্রপাত করেন অ্যারিস্টটল। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৩৫০ বছর পূর্বে তিনি সাহিত্য সম্পর্কে যে মৌলিক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছিলেন তা যুগে যুগে সাহিত্য তাত্ত্বিকদের প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথও তার সাহিত্যতত্ত্বে কাব্য, কাব্যের স্বরূপ, কাব্যের বিষয় ও নির্মাণ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নিয়ে

আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন— "সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্য ও নিয়মের ফল।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যে সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে কোন গভীর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রাথের আলোচনায় সাহিত্য সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা লাভ করি। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত কবি, তাই তার তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেও কবিত্তের প্রলেপ রয়েছে। সেই প্রলেপটুকু সরিয়ে আমরা ক্রমান্বয়ে তার তাত্ত্বিক অনুভূতিটি বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপঃ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেননি। অবশ্য তা দেওয়া সম্ভবও না। কারণ কোন সৃষ্টিকেই সংজ্ঞার নির্দিষ্ট বাঁধনে বেঁধে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন শিল্প ও সাহিত্য হল 'অপ্রয়োজনের আনন্দ"। বাইরের জগৎ মানুষের মনের প্রভাব বিস্তার করে। সেই প্রভাবের ফলে মনের মধ্যে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাকেই ভাশায়-ছন্দে-রঙে রাঙিয়ে তোলাই হল সাহিত্য। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় সাহিত্য চেতনার আত্মপ্রকাশের বাহন। সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় এবংমানব চরিত্র। কিন্তু মানব চরিত্র এটুকুও যেন বাহুল্য বলা হইল। বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষায় রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"

সাহিত্যের সামগ্রী এবং উদ্দেশ্যঃ সাহিত্যের সামগ্রী মানব হৃদয় এবং মানব চরিত্র। মানুষের চিরন্তন সুক্ষ-দুঃখ,আনন্দ-বেদনা, ইচ্ছা-অনুভতি প্রভৃতি সাহিত্যের বিষয়। 'সাহিত্যের সামগ্রী'প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, " সে সকল জিনিশ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য 'আনের হানে। প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রঙ, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্টি হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।"

সাহিত্যের উদেশ্য সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে—উদ্দেশ্যবাদ এবং কলাকৈবল্যবাদ। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই কলাকৈল্যবাদের সমর্থক। অর্থাৎ তিনি মনে করেন শিল্পের জান্যেই শিল্প, সাহিত্যের জন্য সাহিত্য। "সাহিত্যের উদ্দেশ্য" প্রবন্ধে

তিনি বলেছেন, "বিষয়ী লোক বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে বিষয়টা কি? কিন্তু লিখিতে হইলে যে বিষয় চাই-ই এমন কোন কথা নাই। বিষয় থাকে তো থাক, না থাকে তো নাই থাক...। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নয়।"

সাহিত্যে অনুকরণঃ অ্যারিস্টটল 'পোয়েটিক্স" গ্রন্থে অনুকরণ (মাইমেসিস) সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। "অনুকরণ" শব্দের সহজ অর্থ করা যেতে পারে নকল। একথা ঠিক য়ে শিল্পী-সাহিত্যিকগণ সামাজিক মানুষ রূপে বাস্তব সমাজও বৈশ্বিক রূপকে অনুকরণ করেন। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ একথা বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য কখনই বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়। 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে কেবল সাহিত্য কেন কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।" আসলে বাস্তব জগৎ শিল্পী সাহিত্যিকের চেতনায় যে প্রভাব বিস্তার করে, তার সঙ্গে মনের অনুভূতি মিশে তা প্রকাশিত হয়। এই কারণেই 'আমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

"আমারি চেতনার রঙে
পান্না হল সবুজ।
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেল্লুম আকাশে জ্বলে উঠল আলো
পূবে-পশ্চিমে।"

এই আলো জ্বলে ওঠাটাই সাহিত্য এবং তা সৃষ্টি হয় কবির মন থেকে। সুতরাং অ্যারিস্টটলের মতো রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে বাস্তবের অনুকরণ বলে মানতে পারেননি।

কল্পনা ও প্রকাশ :'কল্পনা' বলতে সেই শক্তিকে বোঝানো হয় যার দ্বারা দূরকে কাছে আনাযায়, সীমাকে অসীম করে তোলা যায়। কল্পনা ছাড়া কখনই কোনো সৃষ্টি হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য তত্ত্বের ভাবনায় কল্পনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি মনে করেন, কল্পনার সাহায্যেই একজন স্রষ্টা অপরের মর্মে প্রবেশ করে। কল্পনাই বিচ্ছিন্ন বস্তুবিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং কল্পনাই ভোগের বস্তুকে প্রেমের বস্তুতে রূপান্তরিত করে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘প্রকাশ’ হল সাহিত্যের চরম সত্য। ক্রোচের ভাবনার সঙ্গে এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মিল রয়েছে। ক্রোচে বলেছিলেন, শিল্প প্রকাশ; আর রবীন্দ্রনাথ বলেন, প্রকাশই কবিত্ব। তবে রবীন্দ্রনাথ 'প্রকাশ" শব্দটিকে যথেষ্ট গভীর অর্থে বিশ্লেষণ করেছেন। তার কাছে প্রকাশ হল আত্মোপলব্ধির স্বরূপ নির্দেশ— ‘যদৃষ্টং তলিখিত'-কে তিনি প্রকাশ" বলে স্বীকার করেননি, তাঁর কাছে প্রকাশ হল দেখার পর অনুভূতি আরোপের মাধ্যমে মনের মধ্যে যে নতুন জিনিস সৃষ্টি হয়, তারই স্বরূপ নির্দেশ।

আধুনিকতাঃ রবীন্দ্রনাথকে বলা হত আধুনিকতার বিরোধী । রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিকতাকেকেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, আধুনিকতা সময় নির্ভর নয় মর্জিনির্ভর। বস্তুত রবীন্দ্র সাহিত্যকে আধুনিক বলা উচিত কী, উচিত নয়—তা তর্কের বিষয়। কিন্তুআধুনিক শব্দটি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ আধুনিককালেও

দুর্লভ। মানুষের কাছে যা চিরদিন আনন্দ বহন করে আনে তাই আধুনিক। সেই অর্থে রামায়ণ আধুনিক, মহাভারতও আধুনিক। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তার মুল্যবান মন্তব্যগুলি প্রকাশ করেছেন।

১২.২ "তথ্য ও সত্য" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী

সাহিত্য তত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম "তথ্য ও সত্য"। সাধারণভাবে 'তথ্য' বলতে আমরা সেই বিষয়কেই লনি, যার উপর নির্ভর করে সাহিত্যের বিষয়টি রচিত হয়। যেমন- "তাজমহল" একটি তথ্য, কারণ এর উপর নির্ভর করেই রবীন্দ্রনাথ শাহজাহানের প্রেম, বিরহ, বেদনা, আনন্দের অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। আর "সত্য" বা True হল যা বাস্তব অনুগামী। তবে সাহিত্যের বিষয় সব সময় বাস্তব অনুগামী হয় না, কারণ সাহিত্যের একটি বড় দিক কল্পনা। তাহলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কী সত্যের ধারণা মিথ্যা? এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের-ই একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে—"অনেকে বলেন সাহিত্যে কেবল একমাত্র সত্য আছে সেটা হচ্ছে প্রকাশের সত্য। অর্থাৎ যেটি ব্যক্ত করতে চাই সেটি প্রকাশ করবার উপায়গুলি অযথা হলেই সেটা মিথ্যা হল এবং যথাযথ হলেই সত্য হল। ...প্রকাশটাই হল সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ওইতেই কী শেষ সত্য?" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে প্রকাশকে সত্য হিসাবে স্বীকার করেও একটা প্রশ্ন উত্থাপন করে গেছেন। আমরা তাকেই অনুসরণ করে বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করব।

তথ্য এবং, সত্যের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কযুক্ত বাস্তবতার ধারণা। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'বাস্তব' প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র সমকালে রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচক গোষ্ঠী রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ এনেছিলেন। সেই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তিনি এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি মনে করেন, সাহিত্যে বাস্তবতা থাকা প্রয়োজন, কিন্তু সেই বাস্তবতা কী ধরনের বাস্তবতা? বস্তুজগৎ তো একটা নয়, মানুষের প্রকৃতিও এক রকম নয়। ভিন্ন মানুষ একই বস্তুকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। সুতরাং বাস্তবতা কখনো এক ও অদ্বিতীয় হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবতার কথা বলতে চান, সেটা হল রসের বাস্তবতা। কোনো তথ্যকে অবলম্বন করে এই রস উঘাটনই সাহিত্যিকের লক্ষ্য। যদি তথ্যটি প্রকাশের পথ যথাযথ হয়, তাহলে আমরা তাকে সত্য তথ্য হিসাবে চিহ্নিত করতে

পারি। আর সত্য ও তথ্যের দ্বারা যদি রসবস্তু নির্মিত হয়, তাহলে সেটিকে আমরা বাস্তবধর্মী সাহিত্য বলে চিহ্নিত করব।

‘তথ্য ও সত্য’প্রবন্ধে বিষয়টিকে আরো পূর্ণাঙ্গ রূপে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। এখানে তিনি বলেছেন "যেমনটি আছে তেমনটির ভাব হচ্ছে তথ্য সেই তথ্য, যাকে অবলম্বন করে থাকে সেই হচ্ছে সত্য।" গোলাপ ফুলের উদাহরণ দিয়ে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। গোলাপ ফুলে আমরা আনন্দ পাই। বর্ণে-গন্ধে-রূপে-লেখায় এই ফুলে আমরা একটি সুষমা প্রত্যক্ষ করি।

এর মধ্যে নিজের আত্মরূপ আত্মীয়কে প্রত্যক্ষ করি। প্রত্যক্ষ করি বলেই আনন্দ লাভ করি।রবীন্দ্রনাথের মতে গোলাপ ফুলটি হল তথ্য, আর ফুলটির আনন্দরূপ অংশটুকু সত্য।

সাহিত্য বাস্তব জীবনের বা বস্তু বিশ্বের হুবহু প্রকাশ হতে পারে না। তার কারণ বস্তু জগত " স্রষ্টার মনে প্রবেশ করে তার অন্তর্নিহিত কল্পনাররঙেরঞ্জিত হয় এবং তারপর প্রকাশিত হয়।

অর্থাৎ সৃষ্টি মাত্রই বাস্তব জগতের তিনটি স্তর উর্ধ্বে অবস্থিত। সুতরাং সাহিত্য কখনো তথ্যভিত্তিক বাস্তবধর্মী রচনা হতে পারে না। তবুও সাহিত্যে আমরা যে বাস্তবকে খুঁজে পাই তা বাস্তবের বাস্তবতা নয়, অন্তরের বাস্তবতা।

১২.৩ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব আলোচনায় কল্পনার গুরুত্ব

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি যেমন বিপুল, তেমনি তার সাহিত্য বিষয়ক চিন্তাও বৈচিত্র্যপূর্ণ।তিনি একাধারে রসস্রষ্টা ও রসব্যাখ্যাতা। তার সাহিত্য চিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে 'সাহিত্য’, ‘সাহিত্যের পথে’ এবং ‘সাহিত্যের স্বরূপ’ এই তিনখানি গ্রন্থে তিনি সাহিত্য তত্ত্বের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন— সাহিত্য কী? সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি? সাহিত্যের সামগ্রী কী? বাস্তব সাহিত্য কাকে বলে?

প্রভৃতি। সাহিত্য তত্ত্বের এই বিষয়গুলি নিয়ে পাশ্চাত্যে আলোচনা শুরু করেছিলেন অ্যারিস্টটল। প্রাচ্যে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' সর্বপ্রথম এই আলোচনা পাওয়া যায়। তারপর যুগ যুগ ধরে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন মণীষী নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আলোচনাও একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব আলোচনা। আমরা তাঁর সাহিত্য তত্ত্বের বিশেষ কয়েকটি দিক এখানে উল্লেখ করব।

কল্পনার তত্ত্বঃ কল্পনা নিঃসন্দেহে সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কল্পনা ছাড়া কখনই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কবি সাহিত্যিকগণ এই বিশ্বকে কল্পনার ভিতর দিয়ে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেন এবং সাহিত্যে সেই উপলব্ধিকেই প্রকাশ করেন। এই কল্পনার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মানব মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনা শক্তি। রবীন্দ্রনাথের মতে কল্পনা হল অন্য কিছুকে আপন করে নেওয়া এবং আপনাকে অন্য কিছুতে ব্যক্ত করার ক্ষমতা এই ক্ষমতার জন্যেই তিনি কল্পনাকে 'সোনার কাঠি' বলে উল্লেখ করেছেন কল্পনার প্রসঙ্গেই এসেছে কাল্পনিকতার প্রসঙ্গ। তিনি মনে করেন, কল্পনা কাল্পনিকতার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। কল্পনা যুক্তি শাসিত এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আর কাল্পনিকতা অপরিমিত, অসংযত, অলীক, অযৌক্তিক উচ্ছাস মাত্র। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কল্পনা শুধু লেখকের শক্তি নয়, তা পাঠকেরও শক্তি। কাব্য রচনার জন্য যেমন কল্পনার প্রয়োজন, তেমনি কাব্য উপলব্ধির জন্য কল্পনা অপরিহার্য। বিশিষ্ট দাশনিক কান্ট শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কল্পনাকে সৃজনী শক্তি রূপে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কল্পনা তত্ত্ব প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে বলা যেতে পারে।

অনুকরণ তত্ত্ব : অ্যারিস্টটল অনুকরণ তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি অনুকরণের প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছিলেন "মাইমেসিস" শব্দটি, যার ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'ইমিটেশন'। অ্যারিস্টটল মাইমেসিস বা ইমিটেশনকেই সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুকরণকে সৃষ্টি বলে মানতে চাননি। কারণ তিনি মনে করেন, সৃষ্টি কখন অন্ধ দাসত্ব হতে পারে না । অনুকরণ মানেই হল অন্ধ দাসত্ব। কেবল যা ঘটেছে তার বর্ণনা

দেওয়া কখনই সাহিত্য নয়।তার কারন সাহিত্য কখনই বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়। তিনি বলেছেন, "সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতি তথা বস্তু জগতকে আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং তারপর সেই প্রত্যক্ষীভূত বিষয়কে হৃদয়গত করার পর শিল্প-সাহিত্য হিসাবে প্রকাশ করি। আর এই কারণেই প্রকৃত সত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যের একটা প্রভেদ আছে।

" সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না।তাই বলিয়া সাহিত্যের মার কান্না মিথ্যা নয়।" মিথ্যা নয় এই কারণেই বলা যায় যে, সাহিত্য আমাদের যা জানাতে চায় তা অখণ্ড রূপে জানায়। কিন্তু বাস্তব জগৎ সব সময় খণ্ড রূপে আমাদের কাছে ধরা দেয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুকরণ তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ তত্ত্বের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রকাশ তত্ত্বঃ সৃষ্টির আসল কথা প্রকাশ। প্রকাশহীন সৃষ্টি 'সোনার পাথর বাটি'-র মতোই অলীক। প্রকাশ শব্দটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্রহ্মস্বরূপের যেমন তিনটি দিক—সত্যের দিক, জ্ঞানের দিক এবং অনন্তের দিক, তেমনি মানবাত্মার তিনটি দিক—আমি আছি, আমি জানি এবং আমি প্রকাশ করি। এই প্রকাশের দিকটিই মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যের দিক, আনন্দের দিক। আনন্দের জন্যই মানুষ প্রকাশ করে। তাজমহলের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন, শাজাহান বিরহের অনন্তকে প্রকাশ করার জন্যই তাজমহল সৃষ্টি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকাশ হল অপ্রয়োজনের আনন্দ। তার কারণ শিল্প-সাহিত্য কখনই মানুষের জৈবিক প্রয়োজন মেটায় না। মনের আনন্দেই মানুষ শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করে। সুতরাং নিছক প্রজেনীয়তার বিচারে সৃষ্টিকে মেপে দেখা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে সৃষ্টি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"সৃষ্টির মুল্য জীবনযাত্রার উপযোগীতায় নয়, মানবাত্মার পূর্ব স্বরূপের বিকাশে তা অহেতুক তা আপনাতে আপন পর্যাপ্ত।" পাশ্চাত্য মণীষীদের তত্ত্বে "প্রকাশ" শব্দটি অন্তরের ভাবনাকে বের করে আনা মাত্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ তত্ত্ব অন্তর ও বাইরের একাত্মতার সাধন। সুতরাং এই তত্ত্বটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্যের বিচারকঃ সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি কী হওয়া উচিত তা নিয়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে মণীষীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, আজও যে সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মত প্রকাশ করেছেন 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধটিতে তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, বাস্তব সত্য এবং সাহিত্যের সত্য কখনই এক নয়। তাছাড়া সাহিত্য বাস্তবের অনুকরণও নয়। সুতরাং বাস্তবতার মাপকাঠিতে সাহিত্যের বিচার কখনই সম্ভব নয়। বাস্তব জগৎ খণ্ডিত, সেই খণ্ডিত জগতকে অখণ্ডতার সুত্রে বেঁধে দেয় সাহিত্য। তাই সাহিত্যের সুরটাকে ধরতে হলে চড়াসুরে ধরাই কর্তব্য। এই চড়াসুর বলতে তিনি সুখ-দুঃখ-আনন্দ প্রভৃতি মানবমনের বিভিন্ন ভাবের কথা বলেছেন। যতক্ষণ কোনো সাহিত্য রস স্ফুর্তির দ্বারা মানুষের মনোগত ভাবগুলিকে জাগ্রত করতে পারছে না, ততক্ষণ তা সৎসাহিত্য রূপে বিবেচিত হতে পারেনা।

১২.৪ অনুশীলনী

১।সাহিত্যি তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করো।

২।তথ্য ও সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

৩।রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় কল্পনার গুরুত্ব ও অনুকরণ তত্ত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখ।

১২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১।সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ -সত্যেন্দ্রনাথ রায়

২।সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ১৩ – প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ বাস্তব

১৩.২ বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা

১৩.৩ আধুনিক কাব্য ও আধুনিকতার স্বরূপ বিচার

১৩.৪ সাহিত্যের তাৎপর্য

১৩.৫ অনুশীলনী

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১ বাস্তব

সাহিত্যের বাস্তবতা আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ গোড়াতেই বলে নিয়েছেন এখানে বস্তু বলতে ‘রসবস্তু’—এই মন্তব্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথের ‘বাস্তব’ প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করো।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আধুনিক সাহিত্য তত্ত্বের তুল্যতম বিষয়টি হল সাহিত্যে বাস্তবতা। রবীন্দ্র সমকালেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগটি উত্থাপিত হয়েছিল, তা হল তার সাহিত্য বাস্তবতা বর্জিত। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে ছিলেন যে, একমাত্র গোরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনো রচনাই বাস্তব নয়। সমালোচকদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'বাস্তব' প্রবন্ধটি রচনা করেন এবং পরে তা ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থে স্থান পায়।

‘বাস্তব’ শব্দটি সাধারণ অর্থ হল জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য রূপ কিন্তু সাহিত্য কলত প্রত্যক্ষ জগতের দর্পন মাত্র নয়। সাহিত্যের কাজ রসসৃষ্টি। সাহিত্যিক এই বিশ্ব সংসারের ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করেন, তারপর আপন অনুভূতি রসে জারিত করে তা প্রকাশ করেন। সুতরাং কোন সাহিত্যই বাস্তব জগতের প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য রূপ নয়। সাহিত্যের বাস্তবতা আসলে কল্পনার বাস্তবতা। সাধারণ মানুষ দারিদ্র প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু দারিদ্রের মধ্যে যে অপরিসীম বেদনা কষ্ট,অসহায়তা রয়েছে তা একমাত্র সাহিত্যিকের কলমেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দারিদ্র যে কখনো মহান হয়ে উঠতে পারে, তাও কেবল একজন সাহিত্যিকের কলমেই প্রকাশ পায়।

আসলে সাহিত্যের কাজ রসসৃষ্টি করা 'রসিকের কাছে রসের আবেদনটাই বড়। কিন্তু রস বিচারের নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি নেই। ব্যক্তিগত এবং কালগত ধারণার উপর দাঁড়িয়ে রসের মূল্যায়ণ করা হয়। যে সাহিত্য অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য, মোটামুটি ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে রসিক মানুষের মন জয় করে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের মতে সেটাই বাস্তবধর্মী সাহিত্য।

রস প্রকাশিত হয় বস্তুকে কেন্দ্র করে। বস্তুবাদী সমালোচকগণ এখানেই বাস্তবতার অনুসন্ধান করেন। সমালোচকদের মতে, যে সাহিত্য যতখানি বস্তুকেন্দ্রিক, তা ততখানি বাস্তবধর্মী। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি এখানেই। তিনি বলেছেন, সাহিত্যকে এইভাবে বাস্তবধর্মী করে তুলতে হলে ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য না লিখে ‘পৈতে সংহার’ কাব্য লেখা উচিত। কারণ ততকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিরোধটাই ছিল প্রধান।

বাস্তব জগৎ ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা হয়নি এমন নয়। যেমন ঈশ্বর গুপ্তের কাহিনিই তো বাস্তবধর্মী, কিন্তু বাস্তবধর্মী কাব্যের আবেদন শুধু বর্তমানেই আর রস-সাহিত্যের আবেদন চিরন্তন। এই কারণেই বাল্মীকি, ব্যাসদেব, কালিদাস চিরন্তন কবি। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তারা কেউই তথাকথিত বাস্তব বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেননি। কিন্তু তবুও তাদের সাহিত্য কালজয়ী রূপ লাভ করেছে। আসলে বলার মধ্যে না বলা কথাটাই হল সাহিত্য। কালিদাস যদি বিরহী যক্ষের বিরহ বেদনার কথা না লিখে কয়েকজন কৃষকের

চাষাবাদের কথা লিখতেন তাহলে কী সেটা কখনো বাস্তব সাহিত্য হত? সাহিত্য লোক হিতৈষী শিক্ষক নন। তার কাজ মানুষকে আনন্দ দান করা। সুতরাং সাহিত্যের বাস্তবতা কখনই বাস্তবের বাস্তবতা হতে পারে না, তা সবসমই ভাবের বাস্তবতা।

১৩.২ বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা

রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধে সাহিত্যের স্বরূপ, ধর্ম, বাস্তবগুণ, আধুনিকতা প্রভৃতি বিষয়ে বিতর্ক বহুল আলোচনার পাশাপাশি যুক্তিসম্মত বিচার ও মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন। কখনো কখনো নিজ সাহিত্যকৃতির সমালোচনার প্রত্যুত্তরে সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। 'বাস্তব' প্রবন্ধটি (১৩২১) অনুরূপ একটি প্রবন্ধ। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটি চিরকালীন অভিযোগ এই যে, তাঁর সাহিত্য বাস্তব সংসার এবং বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হয়নি। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখেছেন তাঁর আকাশবিহারী কল্পনার রঙীন স্বপ্ন বিলাসের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজে একথা বারবারই স্বীকার করেছেন যে, বাস্তত্ব জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয় কিন্তু তার সাহিত্য বাস্তব নয়— একথা তিনি মনে করতেন না। আর সেই কারণেই 'বাস্তব' প্রবন্ধে বাস্তব শব্দটির বিভিন্ন অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য এই আলোচনা অপেক্ষাকৃত অপরিণত, অসম্পূর্ণ এবং অগভীর। এই প্রবন্ধের উনিশ বছর পরে লেখা 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধটির মধ্যে বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক পূর্ণ এবং গভীর আলোচনা পাওয়া যায়। 'বাস্তব' প্রবন্ধটি আলোচনার পূর্বে আমরা সাহিত্যতত্ত্ব প্রবন্ধে বর্ণিত বাস্তবতার সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করব—"মানুষ আপন হৃদয়ানুভূতিকে কর্মের দায় থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে কল্পনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, যেখানে অনুভূতির রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য। যেখানে আপন অনুভূতিকে প্রকাশ করার প্রেরণায় ফল লাভের অত্যাবশ্যকতাকে সে বিস্মৃত হয়ে যায়। ...সে আপন ব্যক্তিরূপের দোসরকে পায় বস্তুতে নয়, তত্ত্বে নয়, লীলাময়-তে সে পায় আকাশ যেখানে নীল, শ্যামল যেখানে নব দূর্বাদল। ফুলে যেখানে সৌন্দর্য্য, ফলে যেখানে মধুরতা, জীবের প্রতি যেখানে আছে করুণা, ভূমার প্রতি যেখানে আছে আত্মনিবেদন, সেখানে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের

ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিরন্তন যোগ অনুভব করি হৃদয়ে। একেই বলি বাস্তব, যে বাস্তব সত্য হয়েছে আমার আপন।"কাব্য সাহিত্যের আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথ সে কারণে 'বাস্তব' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আবেদনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কখনোই বস্তুতান্ত্রিকতাকে সমর্থন করেননি। বস্তুতান্ত্রিক বলতে আমরা সচরাচর সেই সাহিত্যকে বুঝে থাকি যার মধ্যে বস্তুগত সত্য-তাই মুখ্য। কিন্তু বস্তুগত সত্য সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে পারে, চিরকালের আবেদন রক্ষা করতে পারে না। 'বাস্তব' প্রবন্ধে এই বিষয়টি রক্ষা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "...কবিতাকে বাস্তব করিবার লোভ আমি আর সামলাইতে পারিতেছি না। খুঁজিতে লাগিলাম। দেশের সবচেয়ে কোন ব্যাপারটা বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। কায়স্থেরা পৈতা লইবে আর ব্রাহ্মণ সভা তাহার পৈতা কাড়িবে, এই ঘটনাটা বাংলাদেশে বিশ্বব্যাপারের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। ...এই বুঝিয়া লিখিলাম 'পৈতা সংহার' কাব্য। তাঁহার বস্তু পিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হায়রে, সরস্বতী কি বস্তপিণ্ডে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন, না-পদ্মের উপরে।" সুতরাং বস্তুত সত্য-তাই সাহিত্যের বাস্তবতা হতে পারে না। সাহিত্যের মধ্যে আমরা অন্বেষণ করি রস-সৌন্দর্য্যকে। এই রসের অবস্থান আবার রসিক লোকের অনুভূতিতে। রবীন্দ্রনাথের মতে, রস-সৌন্দর্য্য স্বীকাল যখন কোন একটা বাস্তবকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়, তখনই সেখানে বাসনুভা তৈরি হয়। বস্তু মলের বিচারে কখনোই বাস্তবমূল্য নিধারিত হতে পারে না। কারণ- "রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্ত বস্তুর দর-বাজার অনুসারে এবেলা ওবেলা বদল হইতে থাকে।" বর্হিবস্তুর স্তুপীকরণের মাধ্যমে কখনোই সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। বাস্তবকে বস্তবসম্মত ভাবে তুলে ধরার ফলশ্রুতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের সাহিত্য কৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি টেনিসন তাঁর সমকালে দেশব্যাপী প্রচার পেয়েছিলেন। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে টেনিসনের আসনও সংকীর্ণ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাঁহার কাব্য যে গুণে টিকিবে তা নিত্য রসের গুণে, তাহাতে ভিক্টোরিয় ব্রিটিশ বস্তুবহুল পরিমানে আছে বলিয়া নহে- সেই স্থূল বস্তুটাই প্রতিদিন ধসিয়া পড়িতেছে।"আমাদের দেশের এক বরেণ্য সাহিত্যিকের সম্পর্কেও

একথা বলা যায়, তিনি হলেন ঈশ্বর গুপ্ত। বস্তুজগৎ নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়, কিন্তু সাহিত্যের লক্ষ্য বস্তুজগৎ নয়, তা উপলক্ষ্য ; প্রকৃত লক্ষ্য হল রস। তাই বাইরের যে কোনো বস্তু নির্বিচারে সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই ওঠানামা করিতেছে—সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাশ, নানা কালের নানা ফ্যাশন। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবির হৃদয়ানুভূতি এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বস্তুগত সত্যতা এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যতা এক জিনিস নয়। প্রথমটি হল তার বাহ্যিক মূল্য এবং দ্বিতীয়টি হল তার আভ্যন্তরীণ মূল্য। রাস্তায় পড়ে থাকা একটি ফুলের মূল্য নানা জনের কাছে নানান রকম। যার মধ্যে সৌন্দর্য্য বোধ নেই সে ফুলটিকে পদদলিত করে যাবে; আবার যার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ আছে এবং সেই সৌন্দর্যবোধ যদি ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তাহলে সেই মানুষ ফুলটিকে তুলে ঈশ্বরের পদতলে দেবে। আবার সৌন্দর্য যদি প্রেমানুগামী হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ফুলটি নিয়ে প্রেমিকার হস্তে সমর্পণ করবে—তিনটিই বাস্তব। কিন্তু প্রথম বাস্তবতার মধ্যে কোনো চিরন্তনতা নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাস্তবতার মধ্যে আছে। এই চিরন্তনতাই হল সাহিত্যের বাস্তবতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই বাস্তব অন্য দুটি বাস্তব অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্যবান।

আলোচনার শুরুতেই একথা বলা হয়েছে যে, 'বাস্তব' প্রবন্ধে সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে তিনি যে ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তা কিছুটা অপরিণত। আসলে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মুলত ভাববাদী। তাই প্রকৃত Realism-কে তিনি বোধ হয় কখনোই উপলব্ধি করতে পারেননি। এই কারণেই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য সম্পর্কে তার যে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ, তা সঠিক পথ অবলম্বন করেনি।বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যও যে কালজয়ী সাহিত্য হতে পারে, বাংলাসাহিত্যে তার সব থেকে বড়ো প্রমাণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩.৩ আধুনিক কাব্য ও আধুনিকতার স্বরূপ বিচার

'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্যতম একটি প্রবন্ধ 'আধুনিক কাব্য' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দে)। প্রবন্ধটি একটি ফরমায়েশী লেখা। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মডার্ণ বিলাতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে।" আধুনিক ইংরাজি কবিতার ভাবভঙ্গী ও ভাষাবিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই একমাত্র প্রবন্ধের মূল্য সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এখানে ইংরাজি কবি প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এক নিরপেক্ষ কবিচিত্তের উপলব্ধির দ্বারা। রাজনীতি ও অর্থনীতির কারণে দেশে ও সমাজে নানান পরিবর্তন আসে এবং এই সামাজিক রূপভেদ সাহিত্যের মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটায়। রূপান্তরের এই বিশেষ কালকেই সাধারন ভাবে বলা হয় আধুনিক। প্রতিটি যুগের সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায়। একথা স্বীকার্য যে, যুগে যুগে সমাজে ও সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য একটি যুগের সাহিত্যের সঙ্গে আরেকটি যুগের সাহিত্যের বৈষম্য প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চালে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ণ। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে।" মানুষের মর্জি যখন রূপ পরিবর্তন করে তখন আধুনিকতাও প্রাচীন মর্জিতে অবস্থান করতে পারেনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ইংরাজি কাব্যে পূর্ববর্তী কালের মর্জি অর্থাৎ আচারের প্রাধান্য লোপ পায়; পরিবর্তে তৎকালীন মর্জি অনুযায়ী ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের নব রূপায়ণ ঘটে এবং তখন সেটাই সেকালের বিচারে আধুনিক হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক কালে আবার আধুনিকতার রূপে পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর ভিক্টোরীয় যুগের সংজ্ঞায় কাব্যের আধুনিকতার বিচার চলে না। ইংরেজি সাহিত্যে কবি বারণসের সময়কাল থেকে যে যুগটি এসেছিল, সেটি সে যুগের বিচারে আধুনিক। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি

বারনস থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ডস্বার্থ, কোলরীজ, শেলি, কীটস।" ওই যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক নিয়েছিল। সেই যুগের আধুনিকতার লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তখনকার কালে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ডস্বার্থ বিশ্ব প্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত, ধর্মগত সকল প্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীটসের কাব্য।"ওই সময় কালের কবি-সাহিত্যিকেরা বিশ্বজগৎটাকে আপন অন্তরে অনুভব করে তাকে ব্যক্তিগত জগতে রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন বলে তাদের কাব্যে মনোহারিতা ছিল বেশি। কিন্তু আজকের দিনের আধুনিকতা। "ছাঁটা-কাপড়, ছাঁটা-চুলের খটখটে আধুনিকতা।" এই আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়েছেন। তিনি সাম্প্রতিক ইংরেজি কবিতার বিশৃঙ্খল আলুথালু রূপাবয়বের এক নিখুঁত চিত্র অতি নিপুণ ভাবে পরিস্ফুট করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি মনে করেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের সৌন্দর্য্য চেতনার অভাব ঘটছে ধীরে ধীরে এবং এই কারণে এখন মনোমত কাব্য সৃষ্টি করা আর সম্ভব নয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য ব্যবস্থায় কাব্য রচনায় এতটাই ব্যয় সংক্ষেপ ঘটল যে, ছন্দে ও ভাষায় সমস্ত রকম বাছা-বাছি চুকে যাবার পথ তৈরি হল। যা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। কাব্যের মধ্যে থাকে একটা মোহের আবরণ। আধুনিক কালে সেই আবরণটাই উঠে গেল। শুধু উঠে গেল বললে ভুল হবে, তাকে জোর করে উঠিয়ে দেওয়া হল। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কোনো এক ইংরেজি কবি নিজেকে সবথেকে বড়ো হাসিয়ে বলে মনে করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাসিয়ে হিসেবে তিনি "সূর্যের চাইতে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়েও বড়ো।" রবীন্দ্রনাথের আপত্তি এই সুর্যের, ওক বনস্পতির এবং অ্যাপলো দেবতার সঙ্গে ব্যাঙের সম্পর্ক তৈরি করাতে। তিনি সাহিত্যে ব্যাঙের গুরুত্বকে অস্বীকার করছেন না। এ কথাও বলেছেন, "আমিও ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাইনে। এমনকি যথাস্থানে প্রেয়সীর হাসির সঙ্গে, ব্যাঙের মকমক-হাসিকে এক পঙক্তিতে

বসানো যেতে পারে ।" কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এই উপমাটি সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন এখনকার কাব্যের বিষয় আর মন ভোলাতে চায় না, তা নিজেকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মহিলা ইংরেজ কবি এমিলোয়েলের লাল চটিজুতা সংক্রান্ত একটি কবিতা উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এখনকার সাহিত্য পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal)। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিকতাকে সাহিত্যে শ্বাশত রূপ দিতে পারে না।

আধুনিক বললে যা গণ্য করা হয়, তার মধ্যে একটা নগ্নতাকে লক্ষ্য করেছেন কবি। আর সাহিত্যে নগ্নতার প্রকাশে চিরকাল আপত্তি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে বাস্তবকে হুবহু বর্ণনা করলে তা আধুনিক হয় না। আবার আধুনিকতার জন্য নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে দেখাও প্রয়োজন। কিন্তু সেই দেখার মধ্যে যেন আনন্দ থাকে। তবেই তা চিরকালের সাহিত্য হতে পারে। কোন সাময়িক উত্তেজনা বা হুজুগকে তিনি চিরন্তন সাহিত্যের মর্যাদা দিতে রাজী নয়। তার মতে এবুপ সাহিত্য আধুনিক নয়। কয়েকটি কবিতা অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি সস্তাদরের সাময়িক আধুনিকতার উদাহরণ দিয়েছেন। এই ধরনের একটি উদাহরণের উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল—"নীলজল নির্মল চাঁদ,/ চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে। ওই শোনো, পান ফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল।/ তারা বাড়ি ফিরাছে রাত্রে গান গাইতে গাইতে।" এই বর্ননার মধ্যে একটা খন্ড চিত্র আছে। চিত্রটি বাস্তব, কিন্তু সাময়িক। কখনোই চিরন্তন নয়। সুতরাং যা বাস্তব রবীন্দ্রনাথের মতে তাই আধুনিক হতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান যেমন নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্যও তেমনি নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে দেখবে এবং শাশ্বত চালের উপযোগী করে তা বর্ণনা করবে, তবেই তা হবে যথার্থ আধুনিক। আধুনিকতার ধারণায় রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হল-(ক) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন। (খ) নিরসক্ত দৃষ্টিতে বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করা। (গ) পর্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলিকে যথার্থ সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করা এবং এই প্রকাশের ব্যাপারে রচয়িতার মর্জিকে গুরুত্ব দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ

আলাচ্য প্রবন্ধে বাস্তবের প্রেক্ষাপটে সাহিত্য গুণান্বিত রচনাকে আধুনিককাব্য হিসাবে অভিহিত করে আধুনিকতার যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

১৩.৪ সাহিত্যের তাৎপর্য

ক) প্রবন্ধের বিষয়বস্তু

বহির্জগতের রঙ, ধ্বনি, আকৃতি প্রভৃতি আমাদের মনের জগতে ভালোলাগা, মন্দলাগা কিংবা সুখদুঃখ, ভয়, বিস্ময়াদির সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের হৃদয়বৃত্তির জারকরসে জারিত হয়ে এক নতুন জগতের আভাস বহন করে আনছে। ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাইরের জগতের চেয়ে মানুষের অনেক বেশি আপন। বাইরের জগতের বড়ো-ছোট সাদা-কালোর সঙ্গে আমাদের মনের জগতের ভালোমন্দ, প্রিয়-অপ্রিয় সব সংবাদই পেয়ে যাই এই জগৎ থেকে। এক মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে অপর মানুষের হৃদয়ের যোগ সাধিত হচ্ছে, এই মানুষের জগতের সাহায্যেই। যুগে যুগে চিরপুরাতন এই প্রবাহ নিত্য নতুন আকার ধারণ করছে। এই অপরূপ মানস-জগৎকে বারবার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে না পারলেই তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একে নষ্ট হতে দেওয়া চলে না—হৃদয়ের এই জগৎ প্রকাশ-ব্যাকুল বলেই চিরকাল মানুষ তাকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করে তুলে চলছে।সাহিত্যের বিচারকালে দেখতে হয়, বিশ্বজগতের উপর সাহিত্যের হৃদয়ের অধিকার রয়েছে কতখানি এবং তা কতখানি স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হতে পেরেছে—এ দুটিতে সামঞ্জস্য-বিধান কষ্টকর হলেও যদি তা' হয়ে উঠতে পারে, তবে সোনায় সোহাগা। কবি-হৃদয়ের কল্পনা-সচেতনতা যত বেশি ব্যাপ্তি লাভ ক'রে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, তার রচনার গভীরতাও ততই বৃদ্ধি লাভ করে এবং তাতে পাঠকেরও তৃপ্তির পরিমাণ হয় সমধিক। এইভাবেই মানব-বিশ্বের সীমা বিস্মৃতি লাভ করে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে মানুষের হৃদয়েরও সাযুজ্য লাভ ঘটছে।

বিশ্বজগৎ কিংবা অন্তর্জগতের বিষয়বস্তু অবশ্যই মূল্যবান্, কিন্তু যদি মূল্যের দিক থেকে এটি তুচ্ছও বিবেচিত হয়, তবু রচনাশক্তির গুণেই এটি মহামূল্য হয়ে উঠতে পারে।

ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে রচনাশক্তির নৈপুণ্য সঞ্চিত থাকে এবং এই শক্তিই মানুষের প্রকাশ-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে যে মানস-জগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তাকে বাইরে প্রকাশ করাটাই বড় কথা—কিন্তু উপায় কী! তাকে এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে হৃদয়-ভাব উদ্রিক্ত হতে পারে এবং তার জন্য নানাপ্রকার সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন। পুরুষের অধিকাংশ পোষাক সোজাসুজি, সাদাসিধে এবং যথাযথ হলেও চলে, কিন্তু সমস্ত সভ্যদেশেই মেয়েদের পোষাকের সঙ্গে শালীনতা, সৌন্দর্যবোধ এবং সরুচির সম্পর্ক স্বীকৃত হয়। সাহিত্যেরও তেমনি প্রকাশের জন্য অলঙ্কার, ছন্দ, ব্যঞ্জনা প্রভৃতির প্রয়োজন, দর্শন বিজ্ঞানের মতো তাকে নিরলঙ্কার হলে চলে না।

অরূপকে রূপের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসতে হলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে নিয়ে আসতে হয়—এই অনির্বচনীয়তা অনুকরণ নয়, তা অলঙ্কারকে অতিক্রম করে পরম আস্বাদ্যতা দান করে। এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠার জন্যই সাহিত্যে চিত্র ও সঙ্গীতের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। ভাষার দ্বারা যাকে প্রকাশ করা যায় না, তাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই চিত্রের প্রয়োজন । উপমা-তুলনা রূপকাদির সাহয্যে মনের ভাবকে চিত্রের মতো করে হাজার রকম করে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের ‘দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়'—এই কথাটির মধ্যে মনের অব্যক্ত ব্যাকুলতা ছবির মতো ফুটে উঠে কি সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লাভ করেনি!

চিত্রের মতোই সঙ্গীতও সাহিত্যের অপর একটি বিশিষ্ট সম্পদ। মনের যে ভাবকে সাধারণভাবে কথায় কোনক্রমে প্রকাশ করা চলে না, সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তা পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। অতি যৎসামান্য কথাও সঙ্গীতের সাহায্যে অসামান্যতা লাভ করতে পারে। কারণ চিত্র এবং সঙ্গীতকেই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ বলে বিবেচনা করা হয়। চিত্রের কাজ ভাবকে আকার দান করা।সঙ্গিতের কাজ ভাবকে গতিদান করা।অতয়েব সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিত্রকে যদি বলা হয় রূপময় দেহ, তবে সঙ্গীতকে বলা চলে গতিময় প্রাণ।

মানুষের হৃদয়বৃত্তির প্রকাশকেই সাহিত্যের এক মাত্র কাজ বলে মনে করলে ভুল করা হবে।মানব চরিত্রও তেমনি এক সৃষ্টি, যাকে অপরাপর জড় সৃষ্টির তুল্য বলে মনে করা চলে নাবা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাকে আয়ত্ত করা চলে না।মানব চরিত্র আমাদের ইচ্ছামত পরিচালিত হয়না। কিংবা যথেচ্ছভাবে ব্যবহারও করতে পারিনা। আমাদের ধরাবাঁধার অতীত এই বিচিত্র মানব চরিত্রকেও অন্তরলোক থেকে বহির্জগতে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজটাও সাহিত্যেরই। এই কাজ দুরূহ কারণ, মানব চরিত্র অতিশয় জটিল, তার লীলা অতিশয় সূক্ষ্ম। মানবচরিত্রকে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ মানুষের কাজ নয়—ব্যাস বাল্মীকি-কালিদাসের মতো মহান কবিদের পক্ষেই এ কাজ এক সময় সম্ভব হয়েছিল।

অতএব সব মিলিয়ে বলা চলে মানব-হৃদয় এবং মানব-চরিত্রই সাহিত্যের বিষয়রূপে বিবেচ্য। অবশ্য মানব-চরিত্র কথাটা বলাই যথেষ্ট নয়—মানুষের মনে মানব-চরিত্র এবং বহিঃপ্রকৃতি যে রূপ থেকে রূপান্তর সৃষ্টি করে চলছে এবং প্রতিনিয়ত যে সঙ্গীত ধ্বনিত করে তুলছে, ভাষায় রচিত সেই চিত্র এবং সঙ্গীতকেই বলা হয় সাহিত্য। ভগবানের আনন্দ যেমন সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করছে, মানুষের হৃদয়ও তেমনি সাহিত্যে আপনাকে ব্যক্ত করছে। স্ব-উৎসারিত ভগবানের আনন্দ সৃষ্টির প্রতিধ্বনিই মানব-হৃদয়ে প্রতিফলিত। ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে মানুষের অন্তরে যে সৃষ্টির আলো দেখা যায়, সাহিত্যে তার বিকাশ ঘটে। তাই বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের সাহিত্যেও রাগিণীর সৃষ্টি করে। এই কারণেই সাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, এমন কি রচয়িতারও নয়, এ এক দৈববাণী।

খ) "হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।" তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা,

“সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিষ দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি: দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।" তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ রূপে-রসে-শব্দে-গন্ধে-স্পর্শে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হয়ে উঠছে। মুহূর্তে মুহূর্তে, আর তারি ছায়া পড়ছে আমাদের মনের মুকুরে। কিন্তু সেই মুকুর কাঁচের পিঠে লেপা পারদে তৈরী নয়, তা'ব্যক্তি-মানুষের মেজাজ-মর্জিতে সৃষ্ট বলেই সেই বিশ্বজগতের ছায়া বাস্তবজগতে অনুকরণ মাত্র নয়। অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি-মানুষ সেই ছায়ার জগৎকে ‘আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নিত্য নতুনভাবে সৃষ্টি করে চলছে। যা ছিল বস্তুবিশ্ব -সাদা-কালো ছটো-বড়োর জগৎ, মানুষের মনোজগতে ঠাই পেয়ে তা হয়ে ওঠে ব্যক্তি জগৎ ভালো লাগা মন্দ লাগার জগৎ। নানা অনুভতি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের মনের বিচিত্র রস মিশিয়ে আমরা এই যে নতুন জগৎ সৃষ্টি করি, তাকে যদি আবার বাইরে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে না পারি, তবে তো তার কোন মূল্য থাকেনা। মনের ভিতর তার সৃষ্টির পরই তার বিলয় ঘটে।কিন্তু এই নিত্য নতুন সৃষ্টি তো নষ্ট হবার জন্য নয়। আমাদের হৃদয়-জগতের প্রকাশ-ব্যাকুলতাকে যথাযথভাবে রূপ দিতে পারলেই তার আর বিনাশের আশঙ্কা থাকে না। আর হৃদয়-জগতকে রূপায়িত করে তোলার একমাত্র উপায়ই হল সাহিত্য। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েই আমরা তুলে ধরতে পারি বস্তুবিশ্বের সেই রূপকে, যা প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তর্জগতকে নিত্য নব নব রূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

এই সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি বিষয়ে ‘সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধের লেখক রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র ‘পুরস্কার’ কবিতায় কবি-নায়কের মুখ দিয়ে বলেছেন

ধরণীর বুকে ধরণীর গায় /সাগরের জলে অরণ্যের ছায়,

আর একটুখানি নবীন আভায়/রঙীন করিয়া দিব।

বিশ্বজগতের ছায়ারূপে ব্যক্তি-মানসের মাধুরী-মিশ্রিত হয়ে যে কল্পজগতের সৃষ্টি হয়, তাকে রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যেই এর সার্থকতা এবং এই প্রকাশিত রূপটিই হল

সাহিত্য। এই সাহিত্যের আবেগ মানুষের মনোজগতে চিরকালই বিদ্যমান ছিল, আছে এবং থাকবে। এই সাহিত্য সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় দুটি বিষয়ের উপরই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। এক, পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের সঙ্গে সাহিত্যিকের মনের যোগ কতটা গভীর ও ব্যাপক এবং দুই, বিশ্বজগতের ছায়ার সঙ্গে সাহিত্যিক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে মনোজগৎ সৃষ্টি করেছেন তাকে কতটা সার্থকভাবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। সোজা কথায় বলা যায়, সাহিত্যিকের বহির্জগৎকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা এবং তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার সামর্থ্যই সাহিত্যের বিচার্য বিষয়। বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের তথা সাহিত্যিকের হৃদয়ের যোগ স্থাপন খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আবার হৃদয় দিয়ে গভীর অনুভূতির সাহায্যে যাকে গ্রহণ করা হল, তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার—তৎসত্ত্বেও যে সাহিত্যিক উভকর্মে সিদ্ধকাম হয়েছেন, তার সৃষ্ট রচনাই উৎকৃষ্ট সাহিত্যকৃত রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। মানুষের দেহটা অতিশয় ছোট, কিন্তু তার মনের ব্যাপ্তি অসীম, তাই বিশ্বময় তার সঞ্চরণ ঘটতে পারে। মানুষ কল্পনা করতে পারে এবং এই কল্পনার রথে চড়ে তার মন বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়তে পারে। এই কল্পনার সাহায্যেই সেই মানুষ বহু বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পায়, অবিশেষের মধ্য থেকে বিশেষকে আবিষ্কার করতে পারে। কবি-হৃদয়ের কল্পনা যত বেশি বিশ্বব্যাপ্তি তথা সার্বভৌমত্ব লাভ করতে পারে, তার সৃষ্টি কর্ম তত বেশি গভীরতা লাভ করে পাঠক হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করে। এর ফলে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "ততই মানব বিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।"—এইটি হলো একদিক বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগাযোগের দিক। এরপর আসে প্রকাশের কথা।

বাইরের জগৎকে কবি আপন হৃদয়ে গ্রহণ করে তাকে নিয়ে নতুন একটা মনোজগৎ সৃষ্টি করলেন : এবার তাকে সাহিত্যরূপে প্রকাশ করতে হবে, যা পাঠকের হৃদয়েও অনুরূপ জগতের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে। সেই সষ্টি যত স্থায়ী হবে, ততই তার সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, হৃদয়ভাবের উপকরণের সাহায্যে যে মানবজগৎ অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তাকে এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে হৃদয়ে ভাব

উদ্রিক্ত হয়, নতুবা নীরব কবিত্বের মতো তা-ও এক বিষম ব্যর্থতায় পরিণত হতে বাধ্য। এখন এই হৃদয়-ভাব-উদ্রেকের নিমিত্ত নানাপ্রকার সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন—যা শুধুই কাজের জিনিস, তা একান্তভাবেই সাদামাটা হলেও চলে যেতে পারে। যেমন, অফিসের জন্য পুরুষের সাদাসিধে পোষাকেই চলতে পারে, তেমন পারিপাট্যের প্রয়োজন হয় না, বরং তা যত বাহুল্যবর্জিত হয়, তা কাজের পক্ষে ততই সুবিধাজনক হয়। কিন্তু মেয়েদের পোশাক এমন আটপৌরে শাদাসিধে হলে চলে না, কারণ তার কাজ তো হৃদয়ের কাজ। অপরের মনে, এই হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করবার জন্য সাজ সজ্জা, কলাকৌশলের প্রয়োজন। তাই পুরুষের যথাযথ হলেও চলতে পারে।কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই।পুরুষের ব্যবহারে চাই স্পষ্টতা, কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ ও আভাস ইঙ্গিতের প্রয়োজন।

সাহিত্যের মাধ্যমে কবি-হৃদয়ের ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যও অনুরূপ সাজসজ্জা ও আভাস ইঙ্গিতের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু সাদামাটাভাবে মনোভাব প্রকাশই যথেষ্ট নয়, এখানে রূপের মধ্যে রূপাতীতে, বাচ্যের মধ্যে অনির্বচনীয়তার আভাস ইঙ্গিতও প্রয়োজন। তা ছাড়া আপনাকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত করবার জন্য সাহিত্যকেও ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির সহায়তা গ্রহণ করতে হয়। দর্শন-বিজ্ঞানের ভাষা নিরলঙ্কৃত শাদাসিধে হলেই চলে, কারণ সেখানে বাচ্যার্থেরই প্রাধান্য। কিন্তু সাহিত্যে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে যেতে হয় বলে ভাষায় দুটি বস্তুর মিশ্রণ ঘটাতে হয়, তার একটি চিত্র, অপরটি সঙ্গীত। প্রথমটি সৌন্দর্য-সৃষ্টির উপাদান, অপরটি সীমাতীতের ইঙ্গিত দান করে। উভয়ের সমাহারে সাহিত্য সার্থকতামণ্ডিত হয়।

গ) "অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা। করিতে হয়।"

অথবা "ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সঙ্গীত।"

অথবা "চিত্র এবং সঙ্গীত সাহিত্যের প্রধান উপকরণ।"

অথবা, চিত্র দেহ ও সঙ্গীত প্রাণ।

অথবা,"বস্তুতঃ বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধবনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা-রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।"

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ আমাদের মনের জগতে যে ছায়া ফেলে, তার সঙ্গে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে আমরা মনের মধ্যেই একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করি। সেই জগতে যেমন থাকে বহির্জগতের প্রতিচ্ছায়া, তেমনি তার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে আমাদের অনুভূতি দ্বারা আয়ত্ত অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রস। ফলে বাইরের বিশ্ব আমাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে নানা বড় নানা ছাঁচে নিত্যনতুন ভাবে রূপায়িত হচ্ছে। আমাদের এই মনের জগতকে আমরা যুগে যুগে মানব-হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিতে পারি বলেই চিরপুরাতন হয়েও এটি নিত্য নবীন রূপে সৃষ্টি হয়ে চলেছে। যদি অপরের হৃদয়ে এটিকে প্রবাহিত করে দিতে না পারি, তবে আর এর কোন সার্থকতা থাকে না, এটি নষ্ট হয়ে যায়।

ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ে সৃষ্ট এই জগতকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে না পারলে অপরের হৃদয়ে তা সঞ্চারিত করা যায় না।আর এই প্রকাশের মাধ্যমই হচ্ছে সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যাক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।"

বাইরের জগতের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ সাধন করে তাকে হৃদয়ের রসে জারিত করে আবার তাকে যথাযোগ্যভাবে প্রকাশের মধ্যে দিয়েই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। অথচ দুটি কাজের কোনটিই সহজসাধ্য নয়। একদিকে নিজের কল্পনা-সচেতন হৃদয়কে বিশ্বের সুদূর সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে য়াবার তাকে প্রতিফলিত করতে হবে নিজের মনের মুকুরে, অপরদিকে নিজের মনের মধ্যে সৃষ্ট এই নতুন জগতকে প্রকাশ করতে হবে এমনভাবে যাতে তা অপরের হৃদয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে ।

একের হৃদয়ের ভাব অপরের হৃদয়ে উদ্রিক্ত করার জন্য কিছু সাজ-সজ্জা, কিছুটা কলা-কৌশলের প্রয়োজন। পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম চালাবার পক্ষে শাদামাটা আটিপৌরে পোশাক যথেষ্ট বিবেচিত হলেও নারীর সম্ভ্রম লজ্জা আদি বজায় রাখবার প্রয়োজনে তাকে কিছুটা সাজ-সজ্জা বেশ-ভূষা করতেই হয়। পুরুষ মানুষের অফিসের কাজ, তাতে বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু নারীর কাজ—তাকে হৃদয় দিতে হয় এবং হৃদয় আকর্ষণ করতে হয়। কাজেই পুরুষের মত শুধু যথাযথ হলেই চলে না, তাকে সুন্দর হতে হয় এবং এই কারণেই তাদের ব্যবহারে অনেক আবরণ, আভাস-ইঙ্গিত চাই। সাহিত্যের ভূমিকাও, রবীন্দ্রনাথের মতে, নারীর মতোই—তারও চাই কিছুটা সাজ-সজ্জা, কিছুটা আভাস-ইঙ্গিত। হৃদয়ের কথাকে অপরের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে হলে তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হয়, তার জন্য একদিকে প্রয়োজন তার বহিঃপ্রসাধন, অপরদিকে চাই অনির্বচনীয়তার ইঙ্গিত। ভাষার কারুকার্য, ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতির সাহায্যেই সাহিত্যের প্রসাধনকর্ম সাধিত হয়। এই অলঙ্কারাদির সাহায্যে সজ্জিত সাহিত্য হয়ে ওঠে চিত্রধর্মী। আর সাহিত্যে অনির্বচনীয়তা, রূপকে অতিক্রম করে রূপাতীতের ইঙ্গিত বহন করবার জন্য প্রয়োজন সঙ্গীতধর্মিতার। রবীন্দ্রনাথ এই চিত্র এবং সঙ্গীত—এই দুটিকেই বলেছেন সাহিত্যের প্রধান উপকরণ।

দর্শন-বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা যদি নিরলঙ্কার হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই কারণ দর্শন-বিজ্ঞানের বক্তব্য স্পষ্ট উচ্চারিত—এটি জ্ঞানের কথা, সরাসরি পাঠকের মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। কিন্তু সাহিত্যের বক্তব্য কখনো বাচ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না কারণ অপরূপকে যদি রূপের দ্বারা প্রস্ফুট করতে হয়, তাহলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করতে হয়। নারীর দৈহিক রূপই তার নয়, তার অতিরিক্ত থাকে হ্রী ও ধী, যাকে অনুভুতির দ্বারাই শুধু গ্রহণ করা চলে—সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনির্বচনীয়তাও অনুরূপ বিষয়। রূপবতী নারীকে অলঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত করলেও তার আসল সৌন্দর্য যেমন অলঙ্কারে আবদ্ধ না থেকে তাকে অতিক্রম করে যায়, ভাষার মধ্যে তেমনি চিত্রধর্ম ও সঙ্গীতধর্ম বাচ্যকে অতিক্রম করে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করে। বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের ‘দেখিবারে আখি-পাখি ধায়’—এই কথাটুকুর মধ্য দিয়ে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে

তাতে শুধু চিত্রটিই নয়, বক্তার ব্যাকুল দৃষ্টির আকুলতাও কী অপূর্ব রূপেই না আত্মপ্রকাশ করেছে। যে কথা শুধুমাত্র ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, উপমা রূপকাদি অলঙ্কারের সাহায্যে তা চিত্ররূপে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। চিত্র ছাড়াও সাহিত্যের অপর একটি প্রধান উপাদান তার সঙ্গীতধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থবিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।" রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়—'হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব'—এই সঙ্গীতের সুরই ভাব ব্যাকুল হৃদয়ের দ্বার উন্মোচনের প্রধান চাবিকাঠি। কবি চিত্রের সাহায্যে যদি ভাবকে রূপায়িত করেন, তবে সঙ্গীত তাকে দান করে গতি। চিত্রকে যদি ভাবা যায় কাব্যের দেহ, তবে সঙ্গীতকে বলা যেতে পারে কাব্যের প্রাণ।

ঘ) "সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় এবং মানব-চরিত্র।"

অথবা, "ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত্র, মানব হৃদয়ের আনন্দসুষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি।"

অথবা, "সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী'।"

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই বিপুল বিশ্ব রূপে-রসে শব্দে-স্পর্শে-গন্ধে বিচিত্র থেকে উঠছে, আর এই বিচিত্র বিশাল জগৎ যখন মানুষের মনের মুকুরে ধরা পড়ছে, তখনই ভাবুক মানুষ তাকে আপন মনের জারক রসে জারিয়ে নিত্য নতুন রূপে রূপায়িত করছে। মানুষের অন্তরে এই যে নবীন মনোজাতের সষ্টি হচ্ছে, কৰি মানুষ রসই জগতকে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন এবং তার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করছেন সাহিতকে। সাহিত্য তাই কবি ও কল্পনাপ্রবণ মানুষের অন্তর-জীবনের আলেখ্য, সঙ্গীত-মুর্ছনায় যা গতি লাভ করে। অতএব দেখা যায়, বাইরের জগত এবং মানব-জীবন এই দুইয়ের মিলনে অন্তরে যে মহা ঐক্যতান ধ্বনিত হয়, তার প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে।–দর্শন

বিজ্ঞানে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করা হয় তাদের সরল সহজ ভাষায় প্রকাশ করতে হয়, তাকে নিরলঙ্কার হলেও চলে। কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে একজনকে অপরের হৃদয়ের দ্বারে যখন পৌছুতে হয়, তখন তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্য একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। উপমা রূপকাদি অলঙ্কারই প্রধানত সাহিত্যদেহে প্রসাধনের কাজ করে থাকে। নারীর রূপকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য অলঙ্কারের একটা উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু তার আসল সৌন্দর্য প্রকাশ পায় যাতে, তা কিন্তু তার লাবণ্য, হ্রী ও ধী—যা অলঙ্কারকে অতিক্রম করে যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অলঙ্কারাদির সাহয্যে অপূর্ব সব চিত্র রচনা করে যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অলঙ্কারাদির সাহায্যে অপূর্ব সব চিত্র রচনা করা চলে—যাথা, বৈষ্ণব কবি বলরামদাসের ‘দেখিবারের আমি-পাখি ধায়’ কিংবা রবীন্দ্রনাথের ‘আমার এ আখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে' অথবা জীবনানন্দ দাসের ‘পাখির নীড়ের মত চোখ’—প্রভৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে শুধু চোখের রূপ ফুটে ওঠে না, অতিরিক্ত একটা অনির্বচনীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। অতএব সাহিত্যে একদিকে যেমন চিত্র ফুটে ওঠে, অপরদিকে তেমনি ভাষার মধ্য দিয়েই ভাষাতীতকে প্রকাশের জন্য সঙ্গীত মূর্ছনা শ্রুত হয়। এই চিত্র এবং সঙ্গীতকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। এরি সাহায্যে।

“অন্তর হতে আহরি বচন/আনন্দলোক করি বিরচণ,

গীতরসধারা করি সিঞ্চন/সংসার ধূলি-জলে।”

কবি মর্ত্যলোকে অমৃতের বার্তা বহন করে নিয়ে আসেন। অতএব দেখা যায়, সাহিত্যে বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব-হৃদরেই প্রতিফলন ঘটে নানাভাবে।কৰি বাইরের জগতকে স্বীয় অন্তরে গ্রহণ করে তাকেই নবভাবে প্রকাশ করেন সাহিত্যে।সাহিত্যের যে ধারাকে আমরা “মন্ময়” বলে গ্রহণ করি এবং গীতিকবিতার মাধ্যমে যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটে থাকে, সেখানেই বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব হৃদয়ের পূর্ণ অধিকার। কিন্তু তার বাইরে রয়েছে বৃহত্তর মানব-সংসার, যাদের নিয়ে রচিত হয় রস-সাহিত্যেরই অপর একটি ধারা গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি, সেখানে মানব-হৃদয়ের মতোই মানব-চরিত্রও একটি অত্যাবশ্যক উপাদানরূপ পরিগণিত হয়। মানব-চরিত্র বড়ই জটিল; জড়-জগৎ আমাদের

ইন্দ্রিয় দ্বারা আয়ত্ত হলেও মানব-চরিত্র তেমন সহজ বস্তু নয়। কোনরকম ধরাবাধা-ছোঁয়ার মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না—অথচ বিচিত্র এই মানব-চারিত্রকেও অন্তরালোকের বাইরে এনে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো দুরূহ কাজের ভারও পড়েছে ঐ সাহিত্যেরই উপর। মানব-চরিত্র এত বৈচিত্র্যপূর্ণ তাতে এত স্তর, তার লীলা এত সুক্ষ্ম, অভাবনীয় ও আকস্মিক যে, কোন সাধারণ লেখকের পক্ষে সেই ব্যাপার ধরা সম্ভব নয় বলে মনে হয়। ব্যাস, বাল্মীকি ,কালিদাস কবিকুলের পক্ষে মানব চরিত্র কে পূর্ণ রূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে।

সুতরাং সাহিত্যের বিষয় শুধু মানব-হৃদয় নয়, মানব-চরিত্রও বটে। বাইরের জগৎ আর অন্তরের জগৎ, মানব-হৃদয় আর মানব-চরিত্র—সব মিলে মিশে যে এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে চলছে নিরন্তর, চিত্র ও সঙ্গীতের সাহায্যে কল্পনাপ্রবণ কবি তাকেই সাহিত্যে রূপদান করে থাকেন।

বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে, মানব চরিত্রের মধ্যে—এক কথায় যে সমস্ত বিষয়কে আমরা সাহিত্য রচনার উপাদান-রূপে গ্রহণ করি, তার সর্বত্রই ভগবানের আনন্দ আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে চলেছে। তেমনিভাবে মানুষের হৃদয়ও আপনাকে নানাভাবে সৃজন করবার, ব্যক্ত করবার প্রয়াস পাচ্ছে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে । ভগবানের সৃষ্টিলীলার প্রকাশের মত কবিরও নিয়ত সৃষ্টি-লীলার প্রয়াস—এইজন্যই বলা হয়—কবিরা ব্রহ্মার ন্যায় স্রষ্টাপুরুষ। এই সৃষ্টিরহস্য বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, ভগবানের আনন্দ-সৃষ্টি যেমন আপনার মধ্য থেকে আপনি উৎসারিত হচ্ছে, তেমনি তারি প্রতিধ্বনি লক্ষিত হয় মানব-হৃদয়ের আনন্দ সৃষ্টিতে। জগৎ-সৃষ্টির আনন্দগীতের মূর্ছনা আমাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে যে অনুকম্পনের সৃষ্টি করে, সাহিত্যের মধ্যে তারই বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের নিঃশ্বাস মানবের চিত্তবংশীতে যে রাগিণী ধ্বনিত করছে, সেটাই ফুটে উঠছে সাহিত্যে। তাই সাহিত্যকে বিশেষের রচনা বা রচয়িতার রচনা মনে করা সঙ্গত নয়—এটি দৈববাণী। বিশ্বস্রষ্টার সানন্দসৃষ্টির প্রতিঘাতেই আমাদের মনের মধ্যে যেসৃষ্টির আবেগ জন্মগ্রহণ করে, তারই সার্থক রূপায়ণ যখন সাহিত্য, তখন তার মধ্য দিয়ে সেই বিধাতাপুরুষের আনন্দধ্বনিই প্রকাশ লাভ করে—একে আমরা আমাদের অর্থাৎ

কোন ব্যক্তি-মানসের সৃষ্টি বলে কোন্ অধিকারে গ্রহণ করব। এ যে ভগবানেরই দান, তারই বাণী বহন করে আসছে যুগ যুগ ধরে বিশ্বের যত সেরা সাহিত্য। কবি রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যসৃষ্টি তথা দৈববাণী সম্বন্ধে বলেন, "বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে ভাষায় ভাষায়, আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে। বিশ্বের তাবৎ সৃষ্টিকার্যে যে সুর ধ্বনিত হচ্ছে তারি প্রতিধ্বনি আমাদের সাহিত্যে। এই দৈববাণী' তথা দৈবপ্রেরণা বিষয়ে মহামতি প্লেটো তার *The Republic* গ্রন্থেও প্রায় অনুরূপ মন্তব্যই প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "For all good poets, epic as well as lyric, compose their beautiful poems not by art, but because they inspired and possessed ... so the lyric poets are not in their mind when they are composing their beautiful strains."

১৩.৫ অনুশীলনী

১। বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা 'বাস্তব' প্রবন্ধে কিভাবে ফুটে উঠেছে?

২। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে আধুনিকতার স্বরূপ বিচার করো।

৩।"সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয় ,প্রথম বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হয়েছে কতটা ।"তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর

৪।চিত্র ও সংগীত সাহিত্যের প্রধান উপকরণ- আলোচনা করো

৫।"ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত্র, মানব হৃদয়ের আনন্দসুষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি।" ব্যাখ্যা করো

৬। "সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী'।" আলচনা করো।

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১।সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ -সত্যেন্দ্রনাথ রায়

২।সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একক ১৪ - প্রবন্ধ বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ সাহিত্যের সামগ্রী

১৪.২ সাহিত্যের বিচারক

১৪.৩ সৌন্দর্যবোধ

১৪.৪ অনুশীলনী

১৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১ সাহিত্যের সামগ্রী

ক) বিষয়বস্তু

অথবা,

সাহিত্যের সামগ্রী কী এবং কী নয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সামগ্রী অবলম্বনে আলোচনা কর।

ব্যক্তিগত আনন্দ চরিতার্থ করবার জন্যে কখনো কবি-সাহিত্যিকরা কলম ধরে না। পাখিরা নিজের উল্লাসেই সেই গান করে কিনা, তাই নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভবপর নয়, কিন্তু লেখক যে পাঠক-সমাজের জন্যেই সাহিত্য রচনা করেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য এর জন্য রচনাকে কৃত্রিম বলবার কোন কারণ নেই। পরের জন্যে হৃদয়ের অনুভূতি সৃষ্টি হয় না, এমন কথা বলা চলে না। নীরব কবিত্ব ও " আত্মগত

ভাবোচ্ছ্বাস" অর্থহীন উক্তি, কারণ সাহিত্যর ধর্মই হলো প্রকাশ । কার মনের মধ্যে কী আছে তা প্রকাশ না করলে কারো পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়, কাজেই যে ভাবোচ্ছ্বাস আপনার মনে লুক্কায়িত রয়েছে, তার সার্থকতা কোথায় ? প্রকৃতিজগৎ বা জীবজগৎ—সর্বত্রই দেখা যায়, প্রত্যেকেই আপনাকে যত বেশি সম্ভব ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে। জীবজন্তু তাদের সন্তানের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছে, গাছপালা তাদের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে বংশবিস্তার করে যাচ্ছে। ওদের চেষ্টা চলছে দেশ ও কাল জুড়ে। মানুষও এইভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করবার জন্য, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার জন্য যুগ যুগ ধরে কত উপায়ে লিপি তৈরি করে যাচ্ছে। মানুষ জানে, তার বাড়ি ঘর, আত্মীয়-স্বজন এমন কি দেহটিও কাল-কবলিত হবে, কিন্তু যাতে তার মনের ভাবনাটা বেঁচে থাকে, তার জন্য এত চেষ্টা, এত যত্ন। গোবি মরভূমির বালুকাস্তুপের মধ্যে প্রাপ্ত জীর্ণ পুঁথিতে আমরা মানব-অন্তরের প্রকাশের চিরন্তন বেদনারই পরিচয় পাচ্ছি। সম্রাট অশোক আপনার কথাগুলি অপরের শ্রুতিগোচর করানোর জন্য, তাদের চিরস্থায়িত্ব দান করার জন্য পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে রেখেছিলেন। দীর্ঘকাল সে লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি, তা যেন এতকাল বোবার মতো শুধু ইশারায় মানব-হৃদয়কে আহ্বান করছে। এখন পাঠোদ্ধারের পর তার মনোভাব আমাদের নিকট ব্যক্ত হয়েছে। অশোকের লেখা অবশ্য সাহিত্য নয়, কিন্তু মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা এতে প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের যাবতীয় শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য—সমস্ত নির্মিতির মধ্যেই মানুষের হৃদয় অপর হৃদয়ের মধ্যে অমরতা চাইছে।

স্বল্পকালীন প্রয়োজন এবং চিরকালীন অমরতার মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমন পার্থক্য রয়েছে উভয়ের প্রকাশধর্মিতার মধ্যেও। আমাদের নিত্য প্রয়োজনের জন্য ধান, গম, যব ইত্যাদির বীজ বপন করি, যার স্থায়িত্ব বর্ষাকাল, কিন্তু অরণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বপন করি কনস্পতির বীজ। অপ্রয়োজনীয় হলেও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষ শাশ্বত জীবন লাভেরই স্বপ্ন দেখে আর সারবান সাহিত্যে প্রয়োজন মেটে কিন্তু তা দীর্ঘস্থয়ী হয় না। জ্ঞানের কথা একবার শুনলেই তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, কারণ জানা কথা বারবার শোনার প্রয়োজন হয় না। আবার নতুনতর আবিষ্কারে এই জ্ঞানও আচ্ছন্ন হয়ে

যায়। জ্ঞানের কথা প্রচারিত হলেই তা সার্থকতা লাভ করে, কিন্তু হৃদয়ভাবের কখনো প্রচারের ফলে পুরনো হয় না কিংবা কখনো এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। সূর্য যে পূর্বদিকে উদিত হয়, তা একবার জানলে আর দ্বিতীয়বার জানার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সুর্যোদয়ের সৌন্দর্য ও আনন্দ শতবার দর্শনেও মনকে ক্লান্ত করে না, বরং নিত্য নতুন চমক জাগায়। অতএব নিজের যে বিষয়কে মানুষ চিরকালের জন্য ধরে রাখতে চায়, তা কখনো জ্ঞানের বিষয় নয়, ভাবের বিষয়। জ্ঞানের বিষয়কে ভাষান্তরিত করলে তার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিও হতে পারে কিন্তু ভাবের বিষয়কে ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করতে হয়, কিন্তু ভাবের কথাকে নানাবিধ ছলা-কলার সাহায্যে সৃষ্টি করে। অপরের মনে সঞ্চারিত করতে হয়। এই কলাকৌশলই ভাবের দেহ। কবির সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই দেহের মধ্যে ভাব-রূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠায়। দেহের আধারটিকে অবলম্বন করেই ভাব-রূপ প্রাণ আপনাকে অনুরূপভাবে প্রকাশ করে। ভাব, বিষয়, তত্ত্ব কারো ব্যক্তিগত সামগ্রী নয় ; যে-কোন ব্যক্তিই যে-কোন ভাব, বিষয় বা তত্ত্বকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করতে পারেন—ঐ আধেয় বস্তুর সার্বজনীনতা স্বীকৃত হলেও রচনাটি লেখকের নিজস্ব। তাই লেখক বেঁচে থাকেন তার নিজস্ব রচনার মধ্যেই, ভাবের মধ্যে বা বিষয়ের মধ্যে নয়। ভাবকে প্রকাশ করার কথা ভাবতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার উপায়ের কথাও ভাবতে হয়। মানুষ দিঘি খুঁড়ে জল বার করে, কিন্তু জল মানুষের সৃষ্টি নয়, মানুষের কীর্তি দিঘি খোড়ায়। তেমনি ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপায়ের মধ্যে শেষোক্তটিই লেখকের নিজস্ব, কারণ ভাব তো সার্বজনীন, এই ভাবকে বিশেষরূপে সর্বসাধারণের আনন্দের সামগ্রী করে তোলাকেই লেখকের কীর্তি বা সাহিত্যসৃষ্টি বলা হয়। যে ভাব সর্বজনের তাকে নিজের করে নিয়ে আবার সকলের করে তোলাই সাহিত্য, ললিতকলা কিংবা যে কোন শিল্প-সৃষ্টি। অঙ্গার বা কার্বন আকাশে বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। গাছপালা তাকে নিগুঢ় শক্তিবলে নিজস্ব করে নিয়ে, পরে অপরের কাজে লাগায়। তেমনি সাধারণ জিনিসকে প্রথমে নিজের করে নিয়ে, পরে বিশেষভাবে সাধারণের করে তোলাই সাহিত্যের কাজ।এইভাবে যদি সাহিত্যকে বিচার

করা যায়, তবে সাহিত্য থেকে জ্ঞানের বন্ধু বাদ পড়ে যায়। কারণ ওয়ানের বস্তু সত্য, তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, দেশে কালে তার রূপ সর্বত্র এক-হৃদয়ের রঙেও তার রঞ্জিত হবার সুযোগ সেই, অতএব সত্য-ভিত্তিক বিজ্ঞানের পক্ষে সাহিত্য হওয়াও সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যে সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর র ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।

খ) "একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে।"

অথবা, "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছাস, সাহিত্যে দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে।"

অথবা, "প্রকাশই কবিত্ব।"

'সাহিত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে 'সহিত' (সহ + ইত) শব্দটি যুক্ত হয়ে আছে, যার তাৎপর্য একটি হৃদয়ের সঙ্গে অপর একটি হৃদয়ের যুক্ত হওয়া। অতএব একজনের মনের ভাব অপরের মনে সঞ্চারিত করতে পারলে তা কখনই সাহিত্য হতে পারে না। তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে একেবারে নিজের আনন্দের জন্যই কোন লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে না। অনেকে মনে করেন, পাখি যেমন আপন মনের উল্লাসে গান করে, কবির মনের উচ্ছাসও তেমনি আত্মগতই। লোকে কিন্তু এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট অসতর্কতার পরিচয় রযেছে। কারণ, পাখি আপন আনন্দেই গান। করে অথবা পক্ষিসমাজের প্রতি তার লক্ষ্য থাকে, তা আমরা জানিনে। বরং সাতিক কালে নানা গবেষণার ফলে পক্ষিতত্ত্ববিদগণ পাখির গানের মধ্যেও তাদের ভাবানুভূতি প্রকাশের পরিচয় পেয়েছেন (এ প্রসঙ্গে জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে—"যুল আপনার জন্য ফোটে না')। কাজেই পাখির দৃষ্টান্ত সুপ্রযুক্ত নয়। সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য আরোপিত হলে হয়তো স্বতস্ফূর্ত নয় বলে এর বিরুদ্ধে কৃত্রিমতার অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে, তাতে অপর কোন হৃদয় উদ্দিষ্ট হলেও তা যেমন কৃত্রিম নয়, তেমনি তাতে স্বতঃমূর্ততারও অভাব ঘটবার কারণ নেই।

সন্তানের জন্যই মাতৃ দুগ্ধ, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কিন্তু তাই বলে মাতৃদুগ্ধ কৃত্রিম এবং এটি স্বতোৎসারিত নয়, এমন অভিযোগ কোন মুর্খ করবেনা। আসলে মানুষ কখনো শুধুমাত্র নিজের আনন্দের জন্যই সাহিত্য রচনা করে না, তার সম্মুখে থাকে পাঠক সমাজ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তারই লেখা অপর এক থেকে উদ্ধার করা চলে ।

“একাকী গায়কের নহে তো গান মিলিতে হবে দুইজনে,

গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাৰে মনে।”

মানুষ নিজের আনন্দের জন্যই সাহিত্য রচনা করে কথাটি যেমন অর্থহীন, তেমনি তারি সমধর্মী দু'টি প্রচলিত কথা “নীরব কবিত্ব” এবং “আত্মগত ভাবোচ্ছাস”-ও সমভাবেই অর্থহীন বলে বিবেচিত হবার যোগ্য। আকাশের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকলেই কোন ব্যক্তিকে কবি বলা যায় না, যেমন যে কাঠ মোটে জ্বলেনি তাকে আগুন বলা চলে না। ব্যক্তি মানুষের মনের অন্তরালে কোন ভাবনা কামনা লুকিয়ে আছে, কোন্ অব্যক্ত বেদনা গুমরে উঠছে, অপর মানুষ তা জানতেও পারছেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কোন বহিঃপ্রকাশ না ঘটছে, অতএব তা নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা থাকবার কথা নয়। আসলে ‘প্রকাশই কবিত্ব’—ভাণ্ডারে কোন বস্তু সঞ্চিত রয়েছে, তা অনুমান করে পুলকিত হওয়ায় বঞ্চনার মাত্রা বাড়তেই পারে, হাতে হাতে মিষ্টান্নটি পেলেই তবে আনন্দকে পূর্ণমাত্রার উপভোগ করা যায়। সাহিত্যে ‘আত্মগত ভাবোচ্ছাস'-ও নীরব কবিত্বেরই প্রায় নামান্তর মাত্র। ব্যক্তির ভাবোচ্ছাস যত তীব্রই হোক, তা যদি আত্মগত থাকে, তার মনের কোণেই শুধু লুক্কায়িত থাকে, তবে অপরের পক্ষে তার উপভোগ সম্ভব নয়। যেখানে পাঠক নেই, রসভোক্তা নেই, সেখানে সাহিত্যের অস্তিত্বই তো কার্যতঃ অস্বীকৃত। অতএব যেমন ‘নীরব কবিত্ব’ অর্থহীন, তেমনি শূন্যগর্ভ উক্তি এই আত্মগত ভাবোচ্ছাস'ও বক্তার মনের ভাব তার নিজস্ব আনন্দ উপভোগের নিমিত্তে নিজের মধ্যেই গোপন রাখলে তাকে আর লেখক বা কবি বলা যাবে না, অথবা সেই ভাবকে যদি যথাযথ প্রকাশের মাধ্যমে অপরের মনে সঞ্চারিত করে দিতে না পারেন, তবে তার সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অতএব লেখক শুধু নিজের জন্যই সাহিত্য রচনা করেন না, এই সহজ সত্যটা স্বীকার করে নিতে হয়।

আমাদের মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতাই হল অপরের মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করতে চাওয়া। এইজন্য সে কেবল ছড়িয়ে দিতে চায়, প্রকাশ করতে চায় বংশবিস্তারের মধ্য দিয়ে মানুষ জীবজন্তু গাছপালা প্রভৃতি সকলেই প্রতিনিয়ত এইভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিজেকে নিজের বাণীকে নিজের কীর্তিকে এইভাবে প্রকাশ করার ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত খুজে পাওয়া যাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেও। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে পাথরের বুকে, ধাতব ঢালাই পাত্রে, পোড়ামাটির বুকে বা গাছের ছালে কতরকম উপকরণের সাহায্যে নানা ভাষায় লেখা লিপির সন্ধান আমরা পেয়েছি। এদের মধ্য দিয়ে সেকালের মানুষ একালেও বেঁচে রয়েছেন। তারা জানতেন বাড়ি ঘর দেহ মন সবই একসময় বিনষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের লেখার মধ্য দিয়েই তাদের মনোভাব প্রকারন্তরে বেঁচে বর্তে রয়েছে। মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমির বালুকা স্তুপের মধ্য থেকে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে কিছু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। যারা এগুলি রচনা করেছিলেন, পৃথিবী থেকে বহুকাল পর্বেই তাদের বিলোপ ঘটলেও তাদের এই অজ্ঞাত লিপির মধ্য দিয়ে তারা একালের পাঠকদের মনের দরজায় পৌছুবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে, তা বুঝতে একটুও দেরি হয় না।

মহামতি অশোক তার বাণীকে লোকের মনে পৌঁছে দেবার জন্য ভারতের সর্বত্র এবং তার বাইরেও গিরিগাত্রে এবং স্তম্ভে অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। তারপর সুদীর্ঘকাল তা রইল প্রায় লোক-লোচনের বাইরে অথবা অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায়। তারপর, তার পাঠোদ্ধার হল— লুপ্ত হয়ে যাওয়া অশোকের মনোভাব সূর্যালোকের মতো স্ব-প্রকাশ হয়ে উঠলো—অশোকের এই লিপিকে হয়তো ‘সাহিত্য’ বলা যাবে না, কিন্তু মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা যে প্রকাশের মধ্য দিয়েই এই সত্যটি এতে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। শুধু সাহিত্যই নয়, চিত্রশিল্পস্থাপত্য সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই ,ভাস্কর্য , এক মানুষের হৃদয় অপরমানুষের মধ্যে যে অমরতা প্রার্থনা করছে, যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে আমরা এই সত্যের সন্ধান পাই। অতএব স্বীকার করতে হয়,

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছাস অর্থহীন বাক্-চাতুরী মাত্র, প্রকাশই কবিত্ব এবং কোন লেখকই শুধু নিজের আনন্দের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি করেন না।

গ) "সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।"

অথবা, "জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়।"

মানুষের হৃদয় অপর মানুষের হৃদয়ে অমরতা প্রার্থনা করে এবং সেই কারণেই নিজের মনের ভাবটিকে পরিস্ফুট করবার জন্য মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে। এই কারণেই 'নীরব কবিত্ব' ও 'আত্মগত ভাবোচ্ছাস' কথাগুলিকে অর্থহীন বাক চাতুরী বলে মনে করা হয়। আসলে প্রকাশই কবিত্ব। নিজেকে প্রকাশ করা, নিজের মনোভাবকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাকে স্থায়ী করে তোলার জন্যই জীবজন্তু, গাছপালা এবং মানুষও বংশ বিস্তার করে। মহামতি অশোক তার বক্তব্যকে, তার মনোভাবকে সর্বকালের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই দেশে দেশে গিরিগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে তার অনুশাসন-লিপি খোদাই করে রেখেছিলেন। প্রত্যেক শিল্পী—তিনি চিত্রকর, স্থাপত্যশিল্পী, ভাস্কর কিংবা সাহিত্যিক যা-ই হন না কেন, চিরকাল ধরে তাদের অবিরাম চেষ্টার পিছনে রয়ে গেছে তাদের হৃদয়-ভাবকে অপরের হৃদয়ে পৌঁছে দেবার তাগিদ। নিজের মনের ভাবকে অপরের মনে সঞ্চারিত করবার দ্বিবিধ প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। একটা প্রয়োজন হতে পারে ক্ষণকালীন, অপরটি চিরকালীন এবং এই দুই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য উপায়ের মধ্যেও যে পার্থক্য থাকবে তা একান্ত স্বাভাবিক। আমরা আমাদের সাম্বৎসরিক প্রয়োজনের জন্য, উদরান্নের সংস্থানের জন্য জমিতে বুনি ধান, গম বা যব। কিন্তু বৃহত্তর প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য চিরকালীন অরণ্যসষ্টির প্রয়োজনে সন্ধান করি বনস্পতির বীজ। প্রথমটির প্রয়োজন তাৎক্ষণিক—তা আমাদের দেহের অনুধা মেটায়, পক্ষান্তরে অরণ্যের প্রয়োজন চিরকালীন—তা একদিকে যেমন পুরুষানুক্রমে আমাদের সন্তান-সন্ততিদের আশ্রয় দান করে, তেমনি আমাদের মানসিক ক্ষুধানিবৃত্তিরও সহায়ক।

আমাদের সাহিত্যেও রয়েছে তেমনি দুটি ধারা—একটিতে আছে ক্ষণকালের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জ্ঞানের কথা বা মননশীল সাহিত্য (literature of knowledge) এবং অপর ধারায় রয়েছে শাশ্বত আনন্দের উৎস 'রস সাহিত্য' (literature of power) বা 'ভাবের কথা। চিরকাল মানুষ চেষ্টা কবে আসছে প্রকৃত রসসাহিত্য সৃষ্টি করতে, কারণ এরই রয়েছে চিরকালীন স্থায়িত্ব। আমাদের দেশেও তাই লেখকরা জানের সাহিত্য বা সারবান সাহিত্য রচনা অপেক্ষা কবিতা-গল্প-উপন্যাস সৃজনধর্মী সাহিত্য রচনাতেই সমধিক আগ্রহী। এ নিয়ে অর্থাৎ সারবান সাহিত্যের অভাব নিয়ে হিতৈষী সমালোচকদের মনে দুশ্চিন্তা জাগতে পারে, কিন্তু লেখকরা যে স্থায়িভাবেই কিছু রচনা করতে চান।

জ্ঞানের কথা একবার প্রচারিত হলে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আবার নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে পুরাতন জ্ঞানের কথা মূল্যহীন বিবেচিত হয়। এক সময় যে-জ্ঞানের বিষয় পণ্ডিতের বুদ্ধি কাম্য হয় না. কিছুকাল পর তা বালকের নিকটও সহজবোধ্য বিবেচিত হতে পারে। ফলে জ্ঞানের কথার কোন শাশ্বত চিরন্তন মূল্য নেই। নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনে সেই জ্ঞানের কথাও আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কিন্ত হৃদয়ভাবের কথা, বহু প্রচারেও কখন পুরাতন হয় না। আবার,—আগুন গরম, জল তরল কিংবা সূর্য পুর্ব দিকে উদিত হয়—এইসব জ্ঞানের কথা একবার জানলে আর দ্বিতীয়বার জানবার দরকার হয় না। অথচ পূর্বাকাশ সূর্যোদয়-দর্শনে মনে যে প্রকাশাতীত অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তা' পুনঃ পুনঃ দর্শনেও পুরাতন হয় না। ভাবের কথা বারবার শ্রবণেও তেমন কোন ক্লান্তি আসে না। বরং প্রাচীনকাল থেকে লোকপরম্পরায় যে অনুভূতি প্রবাহিত হয়ে আসছে, তাতে তার গভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং তা সহজেই আমাদের আবিষ্ট করতে পারে। এই কারণেই মানুষ যদি আপনার কোন জিনিসকে চিরকালের করে রাখতে চায়, তাহলে তাকে ভাবের একমাই অবলম্বন করতে হয়। এই জন্যই বলা হয় সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন ভাবের বিষয়, জ্ঞানের বিষয় নয়।

ভাবের বিষয় চিরকালীন, জ্ঞানের বিষয়েও মেয়াদ স্বল্পকালীন—উভয়ের পার্থক্য শুধুই এইটুকুই নয়। জ্ঞানের বিষয়ে প্রাধান্য বিষয়টিরই অর্থাৎ আধেয় বস্ত্রর—

আধারটির নয়, তাই পাত্রান্তরেও তার সুবোধ্যতার অভাব ঘটে না। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ে ভাষান্তরিত করা ন্যায় এবং তাতে উজ্জ্বলতার বুদ্ধিও ঘটতে পারে। কি ভাবের বিষয়ে এ কথা খাটে না। শুধু বিষয়টির নয়, ভঙ্গিটিও অনুভবযোগ্য। যে ভাষায় লেখক আপনার হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করেন, ভাষান্তরিত হলে তা আর বজায় থাকে না। এক্ষেত্রে আধার থেকে অধোতে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। মানের কথাকে যুক্তি, তর্ক বা দৃষ্টান্ত-সহযোগে শুধু প্রমাণ করলেই চলে, কিন্তু ভাবের কথাকে নানাপ্রকার ছলাকলা, আভাসে ইঙ্গিতে অর্থাৎ ছন্দে অলঙ্কারে নানাভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে এমনভাবে প্রকাশ করতে হয়, যাতে তা সহজেই অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে পারে। এইক্ষেত্রে শুধু বোঝানোটাই যথেষ্ট নয়, তাকে নতুন করে সৃষ্টি করে তুলতে হয়। অপরের হৃদয়ে যদি নিজের ভাবকে সঞ্চার করা না যায়, তবে তা আর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। ভাবকে সঞ্চারিত করবার জন্য যে সমস্ত কলা কৌশলের প্রয়োজন অনুভূত হয়, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তা থেকেই এর প্রকৃতি এবং উপযোগিতা অনুভূত হবে। তিনি বলেন, "এই কলা-কৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে। আদর পায়, ইহার শক্তি অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে।"

ঘ) "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।"

অথবা, "সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের কবিয়া, সেই উপায়েই পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

আমরা যে সাহিত্য পাঠ করে পরম আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠি, তা কোন বিশ্ব-জগৎ-নিরপেক্ষ কবি-পরিকল্পনার সৃষ্ট মায়ার জগৎ নয়। এটি বস্তুতঃ সাবয়ব বিশ্বজগতেরই এক প্রতিরূপ, যার প্রতিফলন ঘটেছে কবির মনোজগতে। এই পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ আমাদের মনের মুকুরে ছায়া

ফেলে ; কেউ কেউ প্রকৃতি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েই তাকে ভুলে যায়, আবার কারো মনের উপর ছায়া দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। যারা কল্পনাপ্রবণ মানুষ, যারা শিল্পী, তারা আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সেই বহিঃপ্রকৃতিকে আপনার মনোজগতে নতুনভাবে রূপায়িত করেন এবং তাকেই শিল্প-সাহিত্যে প্রকাশ করে থাকেন। অতএব শিল্প-সাহিত্যের বিষয় যে প্রকৃতি, অথবা ধরে নেওয়া যাক, মানব চরিত্র, তা কোন ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব নয় ; এই প্রকৃতি বা মানব-চরিত্রের অতএব রচনার বিষয়বস্তু সার্বজনীন তথা সাধারণেরই হয়ে থাকে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রকৃতি কিংবা মানব-চরিত্রকে সাহিত্যের একটি বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অপর যে কোনও বিষয়, ভাব বা তত্ত্ব—যাকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, তার কোনটাই লেখকের নিজস্ব নয়। অতএব সাহিত্যের বিষয় বা ভাবের জন্য কোন সাহিত্যিককে কৃতিত্বের অধিকারী বলা যায় না, তিনি যথার্থ কৃতিত্বের অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়ে থাবেন সেই বিষয় বা ভাবকে প্রকাশের জন্য। লেখকের নিজস্বতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার প্রতিভার কিংবা অনন্যতার চিহ্ন মুদ্রিত হয় যে উপায়ের সাহায্যে তিনি ভাবকে প্রকাশ করেন, তা থেকেই। রবীন্দ্রনাথ একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে দিঘি বলতে জল এবং খনন করা—উভয়কেই বুঝিয়ে থাকে। যদিও এর মধ্যে প্রয়োজনের সামগ্রী হলো জল এবং জলের জন্যই দিঘিটি খোড়া হয়েছে, কিন্তু এই জলের জন্য দিঘির খননকর্তার কোন কৃতিত্ব নেই। জল মানুষের সৃষ্টি নয়, জল চিরন্তন, কিন্তু কোন কীর্তিমান মানুষ সর্বসাধারণের ভোগের জন্য দিঘিকে অনান করে সেই একে অপরের নিকট সহজলভ্য করে দিলেন। অর্থাৎ যে জল পূর্বেও ছিল খননকর্তা তাকে সর্বসাধারণের নিকট পৌছে দিয়েই কৃতিত্বের ভাগী হলেন, সাহিত্যের ব্যাপারটাও অনেকটা তাই। বিষয়, ভাব বা তত্ত্ব---এটিই বরাবরই ছিল ; এটি সর্বসাধারণেরই অধিকারভুক্ত । লেখক শুধু তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে তাদের নিকট সহজলভ্য করে পৌছে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় " ভাব সেইরূপ মনুষ্য সাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় রচনাই লেখকের কীর্তি।"

সাহিত্যের স্রষ্টা বাস্তব জীবন বা বহির্জগৎ থেকেই তার সাহিত্যের উপকরণ গ্রহণ করে থাকেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ মনে করেন যে বিভাব-অনুভাব আদির সহায়তা গ্রহণ

করে কবি বা সাহিত্যিক এই বস্তুকে নিজের অন্তরে ভাবের জগতে রূপান্তরিত করেন। কবি এক অপরূপ প্রক্রিয়ায় তাকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের মনের জারক রসে জারিত করে তাকে বাইরের জগতে সাহিত্যের আকারে প্রকাশ করেন। অতএব যা এতকাল বহির্গতের তথা বিশ্বজগতের বিষয়রূপে ছিল সর্বসাধারণের বিষয়, কবি তাকে মনোজগতে আত্মস্থ করে নিজস্ব বিষয় করে নিলেন। এই প্রক্রিয়ায় কবি কল্পনা, অনুভূতি এবং মননের সাহায্যে নিয়ে থাকেন। এবং তারপর যখন ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারাদি এবং বিবিধ কলা-কৌশলের সহায়তায় সেই আত্মগত ভাবকে আবার সাহিত্যরূপে প্রকাশ করেন, তখনই তা সর্বসাধারণের হয়ে দাঁড়ায়। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ে অপর হৃদয়ের মধ্যে অমরতার প্রার্থনা করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্বত্র অঙ্গার বা কার্বন বর্তমান রয়েছে, এটাকে সাধারণভাবে সাধারণের বিষয় বলে গণ্য করা চলে। কিন্তু গাছপালা তাদের নিগূঢ় শক্তির প্রভাবে এই সাধারণ অঙ্গারকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিজস্ব করে নেয় এবং সেই উপায়েই আবার তাকে সর্বসাধারণের ভোগের দ্রব্যে পরিণত করে। সেই অঙ্গার যে শুধু আমাদের আহার্য বস্তু রূপে অথবা উত্তাপরূপে ব্যবহৃত হয়, তা নয়, রবীন্দ্রনাথের কথায়, “তাহা হইতে সৌন্দর্য ছায়া স্বাস্থ্য বিকীর্ণ হইতে থাকে।” সাহিত্যের কাজও অনুরূপভাবে সর্বসাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করে সেই উপায়েই তাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করে তোলা। তবে জ্ঞানের বিষয় যাকে সত্য বলে অভিহিত করা হয়, তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বলে তার উপর বিচিত্র হৃদয়ের নতুন নতুন রঙের ছায়াপাতের সম্ভাবনা নেই, তাই জ্ঞানের বিষয়কে সাহিত্য বলা চলে না।

১৪.২ সাহিত্যের বিচারক

ক) প্রবন্ধের বিষয়বস্তু

আমাদের হৃদয়-ভাবের দুটো দিক রয়েছে—এটা নিজের জন্য আর একটা অপরের জন্য। নিজের জন্য হৃদয়-ভাবের যে প্রকাশ ঘটে, তাতে একটা স্বাভাবিক সংযম থাকে, কিন্তু পরের জন্য যখন তা প্রকাশ করতে হয়, তখন স্বভাবতই তা অতিকৃত হয়ে থাকে। নিজের হৃদয়াভিলাষকে অনেকটা বড় করে প্রকাশ না করতে পারলে তা যদি বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবে অপরের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় এই আশঙ্কাতেই অনেক সময় সঙ্গতির সীমা ছাড়িয়েই প্রকাশ করা হয়, উদ্দেশ্য—এর মলেই ব্যক্তির হৃদয়-ভাব সাধারণের হৃদয়ভাবে পরিণত হয়ে গৌরব অর্জন করবে। এই কারণেই পুত্রশোকাতুর মাতার বিলাপের সুরও যথেষ্ট চড়া হয়। পুত্রের মৃত্যুতে জগতের হয়তো কোন ক্ষতি বুদ্ধি হবে না, কিন্তু তাতে মাতুহৃদয় যে কত ক্ষতিগ্রস্ত হল, তার উচ্চকণ্ঠে বিলাপের দ্বারা তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এত ক্ষতির প্রাচুর্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরবান্বিত করিতে চায় ! যা বস্তুগতভাবে সত্য, তাকে অপরের নিকট প্রকাশ করায় কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু যা একান্তভাবেই আমার উপলব্ধিগত সত্য, তাকে অপরের নিকট প্রমাণ করতে গেলে তার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করারই প্রয়োজন দেখা দেয়।

তাই, লেখক প্রকৃতি থেকে যা উপলব্ধির সাহায্যে গ্রহণ করেন, তা তার নিকট প্রত্যক্ষগোচর হলেও যখন তিনি তা সাহিত্যের মাধ্যমে অপর ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন তখন পাঠকের নিকট প্রকৃতি আর প্রত্যক্ষগোচর নয় বলেই তাকে অনেকটাই বাড়িয়ে প্রকাশ করতে হয়। তার সাহিত্যকে প্রকৃতির যথাযথ অনুকৃতি বলা যায় না। প্রাকৃত সত্যে এবং সাহিত্য সত্যে এই পার্থক্য চিরকাল স্বীকৃত হয়ে আসছে বলেই সাহিত্য কিংবা কোন প্রকার কলাবিদ্যাকেই প্রকৃতির আদর্শ মনে করা হয় না। লেখকের নিকট প্রকৃতি প্রত্যক্ষ হলেও পাঠকের নিকট তা অপ্রত্যক্ষ বলেই লেখককে

তাহা প্রত্যক্ষ করে তুলতে হয় এবং এর জন্যই বহু শূন্যতা ও অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে, বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্তকে যথাসম্ভব সংহত করে যখন তিনি প্রকৃত সত্যকে সাহিত্য সত্যে রূপান্তরিত করেন, যেন তা অধিকতর সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের ভাব সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য জড়িত-মিশ্রিত ভগ্ন, ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে সাহিত্যে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি। প্রকৃতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয় সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।" প্রকৃতি থেকে মনে এবং মন থেকে সাহিত্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি একই রকম হলেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতি থেকে মন যা গ্রহণ করে, তা শুধু নিজের জন্য, আবার মন থেকে যখন তা সাহিত্যে রূপান্তরিত করা হয়, তখন তা করা হয় সর্বসাধারণকে আনন্দ দানের জন্যই ! একটা বিশেষ সৃজনশক্তির সহায়তায় মনের জিনিসকে বাইরে প্রকাশ করা হয় বলে প্রকৃতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কটা অনেক দূরবর্তী হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় লেখক সাহিত্য রচনা করলেও সেই সৃষ্টি সাহিত্য কিন্তু বর্তমান কিংবা সমকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না জানলে জেনে উপাদান নিয়েই লেখা যে সাহিত্য রচনা করেন, তা শুধু চিরকালেরই নয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, "অন্তরের জিনিস্কে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার ,নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।' জগতের সঙ্গে মনের এবং মনের সঙ্গে সাহিত্যিকের প্রতিভার সম্পর্কটি বলতে হলে আমাদের মনের দ্বিবিধ সত্তা বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুটো অংশের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। একটি অংশ নিজস্ব, অপরটি মানবত্ব এ দুয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, তাতে রয়েছে কাচের শার্সির স্বচ্ছতা—যাতে দুই অংশের দেখাশোনার কোন ব্যাখ্যা ঘটেনা।বরং দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের মতই কাচ অদৃশ্য কে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।এভাবেই সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয়।এই প্রকৃত জগতকে গ্রহণ করছে আমাদের নিজস্বতা। সেই নিজস্বতা নিয়ন্ত্রন করে আমাদের মানবত্ব।এর অপর নাম বিশ্ব মানবমন।এখানেই চলছে সাহিত্য সৃষ্টির কারখানা।

মনের দিক থেকে সত্যতা-বিচার খুব কঠিন কাজ।প্রাকৃত জগতে যা বস্তুঘটিত, তার সত্য নির্ণয়ে অসুবিধে নেই। তাই যা কালো, তা সবার নিকট কালো কিন্তু যা ব্যক্তি-ঘটিত, সেখানে ঐক্যমত্য লাভ কষ্টকর, তাই একের ভালো অপরের নিকট ভালো না-ও হতে পারে। এই ভালোর বিচারের জন্য সর্বাধবাধি লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য শুধু বর্তমানের উপর নির্ভর করা চলেনা। এই কারণেই সাহিত্যিকের লক্ষ্য রাখতে হয় চিরকালের মনুষ্যসমাজের প্রতি। তৎকালিক এবং তার কাছাকাছি পাঠকসমাজের বিচারের উপর নির্ভর করলে তাতে অবিচার হবার সম্ভাবনাই থেকে যায়।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলা যায় তাকেই যা' দেশ-কালের সীমা লঙ্ঘন করেও আপন মহিমা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমকালের বিচারকে অগ্রাহ্য করা চলে না। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে শেষ মীমাংসার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় বলে তো জজকোর্টের বিচার বন্ধ রাখা চলে না, শেষ বিচারে তা বাতিল হলেও সমকালীন বিচারকেও মেনে নিতে হয়।

সাহিত্যিকের মতোই সাহিত্য-বিচারকের প্রতিভাও হতে পারে দেশকালাতিশায়ী। সাহিত্যে যা সত্য, ধ্রুব তা কখন তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। তারা সাহিত্যের নিত্যত্বের লক্ষণ যাচাই করেই তাদের দেহে স্থায়িত্বের চিহ্ন মুদ্রিত করে দেন। এ জাতীয় সাহিত্য-বিচারকরাই স্বভাবে ও শিক্ষায় সর্বকালের বিচারকের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে থাকেন। আবার পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী ব্যবসার বিচারকরা সাহিত্যের বহিঃ শোভাতেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন সাহিত্যের অন্তঃপুরের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে না। কিন্তু যারা সাহিত্যের প্রকৃত সেবক, দেউড়ির দারোয়ানদের দ্বারা যথার্থ মর্যাদাপ্রাপ্ত না হলেও সরস্বতীর দরবারে তারা কখনো অনাদৃত হন না।

খ) “সত্য রক্ষাপূর্বক এই বড়ো করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।"

অথবা, "যেমনটি ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।”

অথবা, "এইজন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।"

জগতের আদি অলঙ্কারিক দার্শনিকদের অন্যতম গ্রিকমনীষী মহামতি প্লেটো কবির রচিত সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন "His work therefore is no more than an imitation of an imitation" অর্থাৎ, কবি-কৃতি বা সাহিত্য হল অনুকরণের অনুকরণ। নিত্য সত্য যে ঈশ্বর, তার মনের ছায়া এই পরিবর্তনশীল বিশ্বজগতের বহিরঙ্গ এবং কবিরা সাহিত্যে এই ছায়াকেই আবার অনুকরণ করেন। কিন্তু প্লেটোর শিষ্য দার্শনিক আরিসস্ততেল তার গুরু এর এই অনুকরণ মতবাদকে স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, কবি বাস্তব সত্যের মৌল বিষয়টি গ্রহণ করে তার সঙ্গে ভাবনা-কল্পনা যুক্ত করে তাকে প্রকাশ করেন। শুধুমাত্র কবিকৃতি নয়, যাবতীয় ললিতকলা নিয়েই উক্তিটি সত্য । কবির কাব্য এক নতুন সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথও 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে প্রকৃত সত্য তথা ব্যক্তিত্বসত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে সাহিত্যকে প্রকৃতির আর্শি বলে স্বীকার কারেন নি। শুধু এই একটি মাত্র প্রবন্ধে নয় সাহিত্য-বিষয়ক আরও নানা প্রবন্ধেই তিনি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিকে কবি নিজের মনে গ্রহণ করে তাকে আপন মনের জারক রসে জারিত ক'রে একটা নতুন রূপদান করেন এবং তার রচিত সাহিত্যে ঘটে সেই নব সৃষ্ট জগতের প্রতিফলন।' সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ভাবে বিষয়টিকে পরিবেষণ করলেও তিনি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তার শেষ সিদ্ধান্তটি এই যে—-প্রাকৃত সত্যের যথাযথ অনুকরণ সাহিত্যে না হলেও তার বিকৃতি সাধন করা হয় না, মৌল সত্যটিকে অবিকৃত রেখেই কবি তাঁর প্রতিভার সাহায্যে তাকে মনোমত ছাপ দান করেন ;তাই সাহিত্য যেমন প্রকৃতির যথাযথ রূপায়ণ নয় তেমনই অপর কোনও শিল্পালাবেও প্রকৃতির আর্শি বলে অভিহিত করা যায় না। প্রকৃতিতে যা প্রত্যক্ষ প্রতীতি, শিল্প-সাহিত্যে তা পরোক্ষ ভাবে প্রতীয়মান।

আমাদের অনুভূতি যতক্ষণে আমাদের মধ্যে এলে ততক্ষণ তা সঙ্গত রূপে বর্তমান কিন্তু তাকে বাইরে প্রকাশ করতে গেলেই বা পরের নিকট তাকে গ্রহণযোগ্য করতে গেলেই তাতে একটু সুর চড়াতে হয় । পুত্রশোকাতুরা মাতার বিলাপের বহিঃপ্রকাশ তার শোকের তীব্রতা প্রকাশের জন্যেই নয়, তার পুত্রের মৃত্যু জগতের সকলের নিকট অবজ্ঞাত হচ্ছে এতে জগতের অপার ক্ষতি হচ্ছে। সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করে তার পুত্রকে যেন 'গৌরবান্বিত করিতে চায়।' আসলে অনুভূতি প্রকাশের ব্যাপারটি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মধ্যেই থাকে, ততক্ষণ তার একটা নিজস্ব সংযম বোধ থাকে। কিন্তু যখনই তা পরের কাছে ঘোষণা করতে হয় তমনি পরের অসাড় চিত্তকে বিচলিত করবার জন্যই তা যাবতীয় সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে উদ্দাম হয়ে ওঠে।

অতএব আমাদের হৃদয়-ভার প্রকাশের দুটো দিককেই মেনে নিতে হয়। আমরা আপন-মনে যে হৃদভাব পোষণ করি, তা' পরের মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে তাকে সর্বসাধারণের বস্তু করে তুলতে। পারলে আমরা গৌরব বোধ করি, আমরা সান্ত্বনা লাভ করি। আমি যাতে বিচলিত বোধ করি, তা যদি অপরের নিকট ঔদাসীন্যের কারণ হয়, তবে আমার মর্মাহত হবার কারণ ঘটে। তাই আমার মনোভাবকে, আমার বক্তব্যকে অপর দশজনের নিকট প্রচার করে তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করবার জন্যই আমরা প্রকাশভঙ্গির উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। যত অধিক লোকের নিকট আমার বক্তব্য প্রমাণিত হবে ততই তা সত্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকার অর্জন করবে। যা প্রকৃত সত্য বা বাস্তব সত্য তা দশজনের নিকট প্রমাণ করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না, সহজেই তা অপর সকলে মেনে নেয় ! আকাশ নীল— একথা প্রমাণ করবার জন্য অতিকথনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যা আমার মতে সত্যমত, কোন প্রকৃত সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকে সকলের নিকট প্রমাণ করতে গেলে সাদামাটা ভাষায় শুধুমাত্র ভাবের প্রকাশই যথেষ্ট নয়, তাকে এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে তা অপরের নিকটও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

অপরের নিকট গ্রহণযোগ্যতার জন্য, অপরের নিকট বিশ্বাস্য-রূপে উপস্থাপনার জন্যই বক্তব্য। বিষয়কে একটু ভিন্নভাবে প্রকাশ করতে হয়। কোন শিল্পী বা সাহিত্যিক কীভাবে কলাকৃতি বা সাহিত্য সষ্টির মাধ্যমে আপনার মনোভাবকে অপরের মনের দরজায় পৌঁছে দেন এ বিষয়ে সমালোচক বলেছেন যে শিল্পী ' makes his state of mind clear to others when it carries the thought content expressed over the thereshold of somebody else's consciousness. Exprssion for the artist is communication.' অপরের মনে প্রত্যয় সৃষ্টির জন্যই লেখককে একটু উচ্চ কণ্ঠে তার বক্তব্যকে একটু অতিকৃত করে বলতে হয়। কোন বস্তুকে দূর থেকে দেখতে হলে তাকে একটু বড় করে না দেখালে তা যে আকার দেখায় তা তার প্রকৃত রূপ নয়। অতএব সত্যের অনুরোধই দূরস্থিত বা অপ্রত্যক্ষ প্রকৃত সত্যকেও বড় করে না দেখালে তা মিথ্যা হয়ে যায়। আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ প্রত্যেকেরই নিজের কোন ব্যবধান থাকে না। কিন্তু অপরের নিকট তা দূরের বস্তু বলেই নিজের ভাবানুভুতি পরের নিকট প্রকাশ করার কালে তার অতিকৃতি প্রয়োজন। প্রকৃত সত্যকে কতখানি কোনভাবে বাড়ালেও তার প্রকাশ অক্ষুন্ন থাকে, তা নির্ভর করে সাহিত্যের প্রতিভা এবং ব্যক্তিগত কলা-কুশলতার উপর। তবে এই যুক্তি-পরম্পরায় এই সত্যই প্রকটিত হলো যে বস্তু সত্য বা প্রকৃত সত্যকে যথাযথভাবে যদি রূপায়িত করা হয়, তবে তা সাহিত্য হয় না। কারণ প্রাকৃতিক জগতে তথা পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিতে আমরা যা দেখতে পাই, তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ সত্য। সাহিত্যেও প্রকৃতিরই রূপায়ণ ঘটে, কিন্তু তাহ'লেও সাহিত্যে দেখতে পাই, প্রত্যক্ষতার অভাব। প্রত্যক্ষতার এই অভাব মোচনের জন্যই সাহিত্যে প্রকৃতিকে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে হয়।

প্রাকৃত সত্য এবং সাহিত্যসত্যের এই প্রভেদ সাহিত্যরসবোদ্ধাগণ সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার অংশবিশেষের কথা উল্লেখ করা চলে। রামচন্দ্রের জীবন কাহিনী রচনায় অনুরুদ্ধ হলে বাল্মীকি যখন বলেছিলেন যে রাম-জীবন তার অজ্ঞাত তখন দেবর্ষি নারদ তাকে বলেছিলেন যে, যা-

ঘটে তা-ই সত্য নয়, বাল্মীকি যা রচনা করবেন তা-ই সত্য। এখানে যা ঘটে তাকে বাস্তব সত্য এবং বাল্মীকির রচনাকে সাহিত্যসত্য'-রূপে গ্রহণ করা চলে। এই সাহিত্য সত্যকেই মহামতি অ্যারিস্ততেল বলেছেন—'higher truth'। পুত্রশোকাতুরা মাতার করুণ বিলাপ অতি-প্রত্যক্ষতার জন্যই সহজে হৃদয়গম্য হয়। কিন্তু তাকে যখন সাহিত্যে রূপায়িত করতে হয়। তখন পরিবেশ রচনা, বর্ণনা, ভাষার ব্যঞ্জনা এবং নানা আভাষে-ইঙ্গিতে তাকে সত্য করে তুলতে হয়। এই দুই কান্নার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সাহিত্যে বর্ণিত মায়ের কান্নাকেও মিথ্যা বা কৃত্রিম বলা চলে না। প্রকৃত মায়ের কান্না অতি-প্রত্যক্ষ বলেই তা আমাদের প্রতীতি-যোগ্য, পক্ষান্তরে সাহিত্যের মায়ের কান্না অপ্রত্যক্ষ বলেই তা উপলব্ধিগম্য, তা শুধুই প্রতীয়মান হয়। অতএব সাহিত্যকে প্রকৃতির আশি। বলা চলে না, আর শুধু সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাকেই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ বলে গ্রহণ করা চলে না।

১৪.৩ সৌন্দর্যবোধ

ক) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য

অথবা, সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে 'সত্যম শিবম সুন্দরম' এর সমন্বয় সাধন করেছেন।

ঔপনিষদিক মন্ত্র স্নাত রবীন্দ্রনাথ তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং জীবনচর্যাতেও যতদূর সম্ভব সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনা করে গেছেন। কাজেই তার সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার ফলোৎপত্তি রূপ যে অনুপম সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন এবং সাহিত্য-বিষয়ে যে ধারণা ও বিশ্বাস জীবনভর পোষণ করে এসেছেন, তা-ও সত্য-শিব সুন্দরের ভাবনায় নিষিক্ত হবে এটিই স্বাভাবিক। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ তার 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে সাহিত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্য ও শিবের নিত্য সম্পর্ককে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। সাহিত্যে-চিত্র-সঙ্গীতাদির রসগ্রহণে প্রথমেই প্রয়োজন সংযমের। এতে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য পালন বলতে গেলে

শুষ্কতারই সাধনা করতে হয়, এখানে রসের স্থান কোথায় ? মনে রাখতে হবে, জমিতে ফসল ফলাতে হলে প্রথম পর্বে এর ঘাস গুল্ম উৎপাটন করে একে একটা মরুভূমির মান্যতাই দান করতে হয়। বস্তুত শেষ রসের জন্য এই প্রাথমিক নীরসতাকে স্বীকার করে। নিতে হয়। কিন্তু নিয়মসংযমকেই চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করলে নিয়মলোলুপতাই হয়তো সপ্তম রিপু হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই নিয়মের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ মনের কঠোরতা বাড়িয়ে দিয়ে স্বভাব থেকে সৌন্দর্যবোধকে একেবারে পিষে মারতে পারে। তাই সংযম সাধনা হবে পরিমিত, যাতে আনন্দের ভিত্তিটা যথেষ্ট শক্ত হতে পারে। দেহের মাংসপেশী প্রভৃতিকে একটা যথার্থ আকার দেবার জন্য যেমন শক্ত হাড়ের প্রয়োজন, সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য তেমনি প্রয়োজন দৃঢ় সংযম। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর জন্য কেউ সারা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় না, তেমনি সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য লাগাম ছাড়া প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলে চলে না।

প্রয়োজনের বিচারে সৌন্দর্যের মূল্য হয়তো বেশি হয়, কি তার যে একটা আনন্দদানের দিক আছে সেটি আমাদের উপরি পাওনা। যে কোন ফলেই আমাদের উদরপূর্তি হতে পারে, তবু যা স্বাদ ,গন্ধ, দৃশ্যে সুন্দর , তার প্রতিই থাকে আমাদের আলাদা আকর্ষণ। আহারের সময়ও এই শোভনতার দিকে আমাদের নজর রাখতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দীনতা আর দাসত্ব প্রকাশ পায়।পক্ষান্তরে আনন্দের সম্বন্ধে মুক্তি আছে বলেই জগতের সঙ্গে কেবল প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রেখে আমরা আনন্দের সম্বন্ধ বজায় রাখতে চেষ্টা করি। এক পতিব্রতা সতী স্ত্রী যেমন প্রেমের যথার্থ সংযমের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ সম্ভব করে, সমাহিত সাধকের নিকটই তাই সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, লোলুপ ভোগী তার স্বাদ পায় না, যেমন পেটুক কখনো ভোজনের রসজ্ঞ হতে পারে না।

বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্তেও যে তাকে দেখতে পাইনে, তার কারণ, আমাদের অন্তরে শুচিতার অভাব। এটা ধর্ম নীতির কথা নয়, এটা আনন্দের কথা, আর্টের কথা। শাস্ত্রেও বলে ‘সুখার্থী সংযতো ভবেৎ'। সুন্দরর বোধকে

চরিতার্থ করতে চাইলে ভোগ লালসাকে দমন করে শুচি হয়ে শান্ত হতে হবে। অতএব ব্রহ্মচর্যের তথা সংযমের সাধনা দ্বারাই, সৌন্দযবোধ উদ্বোধন সম্ভবপর।

বস্তুকে আমরা বিশ্বাস করি তার প্রতক্ষতায়। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে বাস্তবতা অনেকটাই প্রত্যক্ষ, তাই কারো মতে নেপোলিয়ন দেবতা, কেউ তাকে বলে দানব, অথচ উভয় পক্ষই বাস্তবতার দোহাই দেয়। অতএব আসল সত্যটা শুধু প্রত্যক্ষ তার উপর তলাতেই ভেসে বেড়ায় না, খানিকটা তার অপ্রত্যক্ষতার মধ্যেও ডুবে থাকে। তাই যখন দেখি অনেক অসংযত কলাকুশলীরাও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে চলছে তখন সবটাকেই বাস্তব সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। যেমন, যিনি প্রচুর উপার্জন করেন, তিনি যদি প্রচুর ধন নষ্ট করেন, তবে একথা বলা সঙ্গত হবে না যে, যিনি ধন নষ্ট করতে পারেন, তিনি উপাজনও করতে পারেন। বরং এ ক্ষেত্রে বলা উচিত, উপার্জন ব্যাপারে যিনি হিসাবী,সংযমী , বিবেচনা-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, ব্যয়ের ব্যাপারে তার সেই হিসাব-বদ্ধি ছিল না। এইভাবেই বলা যায়, কলাকারগণ যে অংশে প্রকৃত গুণী, সেখানেই তারা সাধক, সংযমী ও তপস্বী পুরুষ। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তারা চরিত্রকে দেখাতে পেরেছেন এবং অন্যত্র তার চরিত্রের অভাব ঘটেছে। এখানে কেউ মনে করতে পারেন, তবে তো সৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতা এবং চারিত্রিক অসংযমের সহাবস্থান সম্ভবপর। উভয়ের অপরিণত অবস্থায় তা কখন কমন সম্ভব হলেও সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণত ভাব কখনো চিত্তের অসংযমের সঙ্গে একই ক্ষেত্রে টিকতে পারে না, তাই বিধাতার সঙ্গে আড়াআড়ি করে বিশ্বামিত্র যে জগৎ সৃষ্টি করলেন, তাতে দম্ভ-ক্রোধ-আদি মিশ্রিত ছিল বলে তা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। আমাদের ক্রোধ-দম্ভ প্রভৃতি ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের মনে করে বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে বিরোধ করতে গিয়েই বিনষ্ট হয়।

নদী তরঙ্গিত হ'য়ে সমুদ্রের দিকে চলতে থাকে, যদি কোথাও পাক পড়ে যায়, তবেই ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়। ফলে যেমন সমস্ত কিছুকে ডোবাবার চেষ্টা করে, তেমনি তার নিজের অগ্রগতিও হয় । আমাদের প্রবৃত্তিও কোন একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হলে নিজের ও পরের সমস্ত কিছু বিনষ্ট করে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে যেন সেই পাক খাওয়া

ঘূর্ণাবর্তের প্রলয়োৎসব চলছে। সঙ্কীর্ণ পরিধিতে তাকে মনোহর বলে মনে হলেও নিখিলের প্রেক্ষাপটে তার সৌন্দর্যের বিরোধ চোখে পড়ে। অতএব এটাকে শিক্ষার সম্পূর্ণতা বলা চলে না, এটা স্বভাব্রে বিকৃতি। বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানের সমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে উত্তেজনা, সাময়িক আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য বলে ভ্রম হয়ে থাকে। চিত্তের প্রশান্তি ছাড়া সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ বর্বরজাতির সৌন্দর্যবোধ এবং বৃহত্তর জগতে স্থাপিত সভ্যজাতির সৌন্দর্যবোধ তাই এক নয়। ছবি-বিষয়ে আনাড়ি ব্যক্তি পটের উপর রঙের বাহুল্য দেখলেই খুশি হয়। যেমন, গ্রাম্য ব্যক্তি দেউড়ির দারোয়ানের চাপ দাড়ি ও চাপরাস দেখেই মুগ্ধ হয়, রাজার মহিমা তার চোখে পড়ে না। তেমনি চিত্রের যিনি সমজদার, তিনি রঙচঙের ঘটায় মুগ্ধ হন না, তিনি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলিয়ে সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য পেতে চান—এটিই তার প্রয়োজন, এতেই তার আনন্দ। এই কারণেই শুধু চোখের দৃষ্টি নয়, তার পিছনে মনেরও দৃষ্টি থাকা চাই—এবং এর জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার। মনের দেখায়। শুধু বুদ্ধিবিচার নয়, তার সঙ্গে হৃদয়ভাবকেও যোগ করতে হয়। ফুলের চেয়েও মানুষের মুখের সৌন্দর্য বেশি মনে হয় এই কারণেই যে, এতে আকৃতির সুষমা ছাড়াও রয়েছে চেতনার দীপ্তি বৃদ্ধির সূর্তি। হৃদয়ের লাবণ্য, একই কারণে ঈশ্বরের মহাদূতরূপে আবির্ভূত হয়, শ্রেষ্ঠদের প্রতি আমাদের আকর্ষণ হয় আরো গভীর।

এখনে আবার একটা প্রশ্ন ওঠে মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক কী? আমাদের ভালো করে কিংবা প্রয়োজন সাধন করে বলেই কি মঙ্গলকে সুন্দর বলা হয় তা নয়, যা কিছু মঙ্গল, তার সঙ্গে জগতের একটা গাভীরতম সামঞ্জস্য রয়েছে বলেই তা সুন্দর। সৌন্দর্য মূর্তি ও মঙ্গল মূর্তি বস্তুত অভিন্ন। মঙ্গলের একটা নিজস্ব ঐশ্বর্য আছে। যার কাছে ক্ষতি ও ক্লেশ নগণ্য বলে মনে হয়। সৌন্দর্য যেমন মানুষকে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে প্রবৃত্ত করে, মঙ্গলও সেই রূপ করে। জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে।সৌন্দর্য ও মঙ্গল মানষের জীবনের মধ্যে তাই করে। মানুষের অন্তরের সৌন্দর্যই মঙ্গল। ভোজের আয়োজনে প্রাচুর্য ও সাজ সজ্জা ভালো, তবে তার সঙ্গে যদি যজ্ঞকর্তার হৃদ্যতা যুক্ত

না হয়, তবে সবই ব্যর্থ। এই হৃদয়টাই ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য—এরি সঙ্গে যুক্ত থাকে গভীরতর মঙ্গল ও সৌন্দর্য।

গর্ভিণীনারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় য়ুরোপীয় কবি-সাহিত্যিক কুণ্ঠাবোধ করলেও নারীর চরম সার্থকতা লাভের মুহূর্তটিকে বর্ণনা করতে আমাদের প্রাচীন কবি অকুণ্ঠ ছিলেন। শরতের মেঘের বর্ণ-বিলাস কিংবা বসন্তের মলয় বাতাস বর্ণনায় কালিদাসের অপারগতা ছিল, এমন কথা বলা যায় না, তবু "মেঘদূত" কাব্যে তিনি যে বর্ষার মেঘ, যা মঙ্গলময় পরিপাতির গম্ভীর মাধুর্যে ভব ছিল, তাকেই বার্তা বহন কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন, তার কারণ এতেই "সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল ব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাথিয়া গাথিয়া তৰে কবির সৌন্দর্যৱস-পিপাসু চিত্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছে।" 'কুমারসম্ভব' কাব্যেও কবি অকালবসন্তের আকস্মিক উৎসবে হরপার্বতীর মিলন ঘটায় নি, তপস্যার অগ্নি দ্বারা উজ্বল করেই তবে পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের মিলন সাধন করেছেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকেও যখন অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা মিলিত হয়েছে তমনি রাজ- দম্পতির মিলন সার্থক হয়েছে। ফুল যখন ফলের গাঢ়তর মাধুর্যে পরিণত হয়েছে, তখনই সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গল একান্ত হয়ে উঠেছে। যখনই সুন্দর ও মঙ্গলের সম্মিলন ঘটেছে, তখনই ভোগবিলাস দূরীকৃত হয়েছে। তাই অশোকের মহৎকার্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না তার প্রমোদ উদ্যানে কিবা রাজপ্রাসাদে, তা বর্তমান রয়েছে। দুর্গম গিরিশিখরে, নির্জন সমুদ্রতটে, বিভিন্ন স্তুপ ও স্তম্ভে। নগর রাজধানীকে বাদ দিয়ে অরণ্য-পর্বতে এই সৌন্দর্য-সৃষ্টির কারণ এই, এখানে মনুষ্য-রচিত সৌন্দর্য জগতের বৃহত্তর সৌন্দর্যকে অভিবাদন জানাচ্ছে। মানুষের শক্তি ও ভক্তি এখানে আপন সৌন্দর্য রচনাকে মঙ্গলময়ের মঙ্গলরূপের পার্শ্বে বসিয়ে ধন্য হচ্ছে। বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মীর মিলনের মতই এখানে মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন ঘটেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বাসনা থেকে সৌন্দর্যকে দূরে সরিয়ে না নিলে তার মধ্যে পূর্ণতা আসে না আর এই জন্য প্রয়োজন সংযম-সাধন। সৌন্দর্য যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য, ততক্ষণ তা স্পষ্ট, অসুন্দর থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। বুদ্ধি যখন সৌন্দর্যবোধের সহায় হয়, তখন সুন্দর-অসুন্দরের ভেদাভেদটা আর তত স্পষ্ট থাকে না। মন তখন সামঞ্জস্য খুঁজে বেড়ায়, সেটা মিললে

আনন্দ বোধ করে, মনে তাকেই সুন্দর বলে মেনে নেয়। এর সঙ্গে যখন কল্যাণবুদ্ধি যুক্ত হয়, তখন সুন্দর অসুন্দরের স্বচ্ছ আরও ঘুচে যায়। সতী যতক্ষণ রূপসী ছিলেন, ততক্ষণ মহাদেবকে পাননি, কিন্তু যখন ভাবরসে স্থিত হয়ে সুন্দরী হলেন, তখনই শিবকে লাভ করলেন। সৌন্দর্যের সঙ্গে শিবের অর্থাৎ মঙ্গলের মিলনেই সত্যের যথার্থ রূপ দেখা দিল।

সত্যের যথার্থ উপলব্ধিতেই আনন্দ এবং তা-ই চরম সৌন্দর্য। এই চলমান সংসারে যেখানে আমাদের মন বসে, সেখানেই আছে সত্যের স্বাদ। বস্তুত যেখানেই সত্যের উপলব্ধি, সেখানেই আনন্দকে পাওয়া যায়। মানুষের সাহিত্যাদি যাবতীয় শিল্পকলা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করে দেখাচ্ছে। সমস্ত তুচ্ছকে অনাদৃতকে সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করে সাহিত্য কলা-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তুলছে। পাশ্চাস্থ্যের কবি বলেন 'truth is beauty, beauty truth', আর আমাদের দার্শনিক বলেন, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, তা-ই আনন্দরূপ, তাই-ই অমৃত। অর্থাৎ সবাই। বলেন সত্যই সুন্দর আনন্দময়। কাব্যে-সাহিত্যে সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপকেই প্রকাশ করা হয়। সত্যকে ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং হৃদয় দ্বারা পেলেই তাকে সাহিত্যে প্রকাশ করা যায়। সাহিত্য যেমন হৃদয়ের আবিষ্কার, তেমনি এতেও আছে সৃষ্টি-নৈপুণ্য মরুভূমির বুকে পিরামিডে,পর্বতগুহা কিংবা কনরকের সুর্যমন্দিরে মানুষ আপনার সৃষ্টি-নৈপুণ্যের যে নিদর্শন রেখেছে, তাতে রয়েছে সত্যকে সে যতটা আনন্দরূপে অনুপে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তারই চিহ্ন। সাহিত্যও এরূপ চিহ্ন। যুগে যুগে মানুষের মন এইভাবেই চিহ্ন একে একে সত্যের সুন্দরের মূর্তির প্রতি মানব-হৃদয়কে আহ্বান জানিয়ে চলছে। দেশে কালে এই চিহ্ন বিস্তৃত হয়ে চলেছে। এই বিশাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে আজ আমাদের হৃদয়ের জন্য হয়ে উঠেছে, তার কারণ মানুষের এই আবিষ্কার-চিহ্ন সাহিত্য। শাস্ত্রে সত্যের বিবিধ শক্তির কথা বলা হলেও সাহিতা বলে, যে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। তিনিই রস, এই রসকে লাভ করেই মানুষ আনন্দিত হয়।

খ) "সৌন্দর্য সষ্টি করাও অসংযত কানাবকি কম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগিছি। দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না।"

অথবা, "যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভাগীর কাছে নহে।"

অথবা, "সৌন্দর্যবোধ ঠিকমত উদ্বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্মের সাধনই আবশ্যক।"

অথবা, "সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে।"

অথবা, রবীন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধের অনুসরণে সংযমের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্কটি বিচার কর।

প্রাচীন ভারতে প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন ছিল আবশ্যিক। এর যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। মনে হতে পারে শিক্ষাকালের এই কঠোর সাধনা মনকে শুরু করে তুলতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের জন্যই প্রাথমিক পর্যায়ে এই সংযম সাধনার প্রয়োজন, রসের জন্যই এই নীরসতার আয়োজন। কৃষক উপযুক্ত হসল প্রাপ্তির আশাতেই ক্ষেতের ঘাস গুল্ম উৎপাটন কলে তাকে মরুভূমির মত করে তোলে। নিয়ম সংযমটা তাই চরম প্রাপ্তির পথে উপলক্ষ্য মাত্র, কিন্তু এটিকেই যদি লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয় তবেই নিয়ম-লোলুপতা ষড়রিপুর মতো অপর একটা রিপু হয়ে জীবনকে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত করতে পারে। এই অবস্থাটা বলা চলে মানুষের জড়তার লক্ষণ। পরিণামহীন এই প্রচেষ্টায় নিবৃত্তিই প্রবল প্রবৃত্তির আকারে জীবন থেকে সৌন্দর্যবোধকে নিষ্পিষ্ট করে দিতে পারে।

পূর্ণতা লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে নিয়ম সংযমকেও সংযত রেখে এগুতে পারলেই দেহে-মনে পুষ্টি আসে। দেহের মাংসপেশী প্রভৃতিকে নিয়মিত আকার দিতে হলে তার জন্য একটা শক্ত হাড়ের খাচা চাই। তেমনি জীবনের শক্ত ভিত্তিই হলো সংযম, জ্ঞানআনন্দ প্রভৃ ,তিকে এমনি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হয়। সংযমের মধ্যে বিচার, বল, ত্যাগ, দৃঢ়তা সবই

থাকবে। প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পারায় শিশু যেমন থালার ভাত ছড়িয়ে ফেলে, গায়ে মাখে, কিন্তু পেটে যায় অল্পই, তেমনি চিত্রকে সংযত করতে না পারলে পরিপূর্ণভাবে সৌন্দর্যকেও ভোগ করা যায় না। অতএব সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যও কল্পনা বৃত্তির সংযম অত্যাবশ্যক। যদি কল্পনার উদ্দামতা কিংবা প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে নিজের আয়ত্তে না রাখা যায় তবে অবস্থাটা এমন হবে যেখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালানোর জন্য একটি প্রদীপশিখাই যথেষ্ট, সেখানে যেন গোটা ঘরেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো।

তাবে একথাও সত্য যে আমাদের প্রবৃত্তির তুষ্টির সঙ্গে সৌন্দর্যেরও একটা সম্পর্ক আছে— এটা অবশ্য উপরি পাওনা। ক্ষুধা নিবৃত্তির আয়োজন ছাড়াও ফলের স্বাদে, গন্ধে, দৃশ্যে এককথায় সৌন্দর্য- এগুলি না থাকলেও ফল খেতে হতো, কাজেই এর সৌন্দর্যটা একটা অতিরিক্ত পাওনা। ক্ষুধা তৃপ্তির সঙ্গে সৌন্দর্য যুক্ত থাকে বলেই আমরা গোগ্রাসে গিলতে বসি না, তার মধ্যেও একটা শোভনতা রক্ষা করে চলি। এই শোভনতাই আমাদের ক্ষুধার প্রবৃত্তিকে উগ্র হতে দেয় না। অতএব সৌন্দর্যবোধ আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে আনন্দের সম্বন্ধ পাতায় এবং এতেই আমাদের মুক্তি। অতএব দেখা যাচ্ছে, সৌন্দর্য যেমন আমাদের ক্রমশ শোভনতা ও সংযমের দিকে টানছে, ঠিক তেমনি বিপরীতক্রমে সংযমও আমাদের সৌন্দর্যভোগের গভীরতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। | পতিব্রতা সতী সাধ্বী স্ত্রীই প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পাৰে, স্বৈরিণী নারীর পক্ষে তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সৌন্দর্যপ্রিয়তার মধ্যে অনুরূপ সতীত্বের সংযমের প্রয়োজন। পেটুক ব্যক্তির আনন্দ ভুরিভোজনেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রকৃত ভোজন রসজ্ঞ সে হতে পারে না, কারণ আহার বিষয় তার শুচিতা বা রুচিবোধ অথবা সংযম নেই ; পৌষ্যরাজ উতঙ্ককে বলেছিলেন যে অন্তঃপুরে গেলে তিনি মহিষীর দর্শন পাবেন, কিন্তু অশুচি অবস্থায় ছিলেন বলে উতঙ্ক মহিষীকে দেখতে পেলেন না। এ সমস্ত থেকেই প্রমাণিত হয়, যিনি লোভী এবং ভোগী, তিনি যথার্থ সৌন্দর্যের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেননা।একমাত্র সমাহিত সাধকের নিকটই যথার্থ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষবৎ আবির্ভূত হয়। শুধু ধর্মনীতির দিক থেকেই নয়, আনন্দের দিক থেকে, খাঁটি আর্টের দিক থেকে বিচার করলেও সৌন্দর্যের প্রয়োজনে সংযমের উপযোগিতা স্বীকার করে নিতে হয়। শাস্ত্রেও বলেছে, সুখের জন্যও সংযমী

হবে। ইচ্ছার চরিতার্থতার জন্য যেমন ইচ্ছাকে দমন করতে হয়, তেমনি সৌন্দর্য ভোগ করতে চাইলেও ভোগ লালসার প্রবৃত্তিকে দমন করা প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্যসাধনকে তাই সৌন্দর্যবোধের উদ্বোধনের নিমিত্ত অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হয়। তবে বাস্তব অবস্থা-বিশ্লেষণে অনেক সময় একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে কারণ, অনেক সময় অনেক গুণী কলাকুশলীকেই অসংযত জীবন-যাপন করতে দেখা যায়। তা থেকে মনে হতে পারে যে অসংযত জীবনও সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং ভোগ করতে পারে। কিন্তু মানুষ-সম্বন্ধে বাস্তব বৃত্তান্তকে বিচার করলেই আমরা ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হবো।

প্রত্যক্ষতার জন্যই আমরা বাস্তবকে বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে যা বাস্তব, তা অনেকটা অপ্রত্যক্ষ বলেই বিচারে বিভ্রান্তি ঘটে। তাই নেপোলিয়ন কারো মতে দেবতা, কারো মতে দানব। কাজেই মানুষের যে অংশ প্রত্যক্ষ, তাতেই আসল সত্যটা ভেসে বেড়ায় না, তা ডুবে থাকে অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই। জগতের গুণী শিল্পীদের সম্বন্ধেও কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। তারা প্রকৃতই যেখানে গুণী, সেখানে তারা সাধক তপস্বী, চিত্তের সাধনা ও সংযম সেখানে অবশ্য বিদ্যমান। তাদের এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত ও অপ্রত্যক্ষ বলেই সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে। তাদের চরিত্রের অসংযত দিকটাই প্রত্যক্ষ বলে সাদা চোখে ওটাই ধরা পড়ে। এ অবস্থায় মনে হতে পারে— তাহলে চরিত্রের অসংযম এবং সৌন্দর্যবিকাশ-ক্ষমতার বুঝি সহাবস্থান সম্ভবপর। উভয়ের অপরিণত অবস্থায় এটি সম্ভবপর হলেও পরিণত অবস্থায় তা সম্ভব নয়, তখন প্রবৃত্তির বিক্ষোভ ও চিত্তের অসংযম কখনো সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে একত্র থাকতে পারে না। এই কারণেই বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও দম্ভের সৃষ্টি নতুন জগৎ খাপছাড়া হয়ে থেকে পরে বিনষ্ট হলো। আমাদের লোভ-ক্রাধাদি অসংযত প্রবৃত্তি নিজের চারদিকে এমন-সকল বিকার উৎপাদন করে, যাতে বিধাতা-সৃষ্ট জগতের বিরুদ্ধেই শুধু তার আস্ফালন নিবদ্ধ থাকে না, যা কখনো সত্যের, সৌন্দর্যের স্বরূপকেও পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সৌন্দর্যবাে◌ধ বা সৌন্দর্যের সৃষ্টির সঙ্গে সংযমকে ওতপ্রোতভাবেই জড়িত বলে স্বীকার করে নিতে হয়।

গ) "সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই, তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকে না।

অথবা, "সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ।"

অথবা,রবীন্দ্রনাথের 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধের অনুসরণে সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের সম্পর্ক বিচার কর।

কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সৌন্দর্য যখন আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করি, তখন শুধু তার বাইরের লাশটাই চোখে পড়ে। কিন্তু যখন তাকে মন দ্বারা দেখি তখন তার সঙ্গে বুদ্ধি-বিচার, হৃদয়-ভাব, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি যুক্ত হবার ফলে দৃষ্টিসীমা অনেকখানি প্রসারিত হয়। ফলত সৌন্দর্য থেকে তখন ধর্মনীতি, ভালোমন্দের বিচারও এসে যায় । অতএব কারও কারও মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলকে বিজড়িত করবার সার্থকতা কোথায় ? এই দুয়ের আকর্ষণ প্রণালীতে পার্থক্য আছে বলেই এদের ভিন্ন নাম, ভিন্ন পরিচয়। ভালোর প্রয়োজনীয়তা আমাদের মুগ্ধ করে, সেটা আমরা জানি, কিন্তু সুন্দর যে কেন আমাদের মুগ্ধ করে তা আমাদের জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মঙ্গল আমাদের প্রয়োজন সাধনা করে বলেই যে সুন্দর তা নয়। প্রয়োজন সাধনের উর্ধেও তার একটা অহেতুক আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু যা কিছু প্রয়োজন সাধন করে, যেমন ভাত-কাপড়, ছাতা-জুতা প্রভৃতি—তাদের আমাদের প্রয়োজন সাধনোপায় বা মঙ্গল বস্তু বলেই গ্রহন করতে পারি, কিন্তু এগুলি আমাদের হৃদয়ে সৌন্দর্যের পুলকসঞ্চার করে না। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের সঙ্গে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণও বনে গেলেন এই সংবাদটি আমাদের হৃদয়কে কাতর করে তোলে।বস্তুতঃ সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখতে পেলেই সৌন্দর্যের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। শতদল পদ্ম, পূর্ণিমার চন্দ্র প্রভৃতি যেমন নিজের মধ্যে এবং চারপাশের জগতের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সুষমা নিয়ে বিরাজ করে বলে সুন্দর, তেমনি করুণা, ক্ষমা, । প্রেমও সুন্দর। সমুদ্রমন্থনে শুধু যে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নিয়েই লক্ষ্মী আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা । নয়, তিনি মঙ্গলমূর্তিও ধারণ

করেছিলেন। অতএব দেখা যায়, সৌন্দর্যের মধ্য দিয়েই যেমন মঙ্গলের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, তেমনি মঙ্গলের মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের—মঙ্গলমূতি ও সৌন্দর্য্যমূর্তি একাত্মতা লাভ করে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলেই সৌন্দর্যকে ঐশ্বর্য বলা চলে। ঠিক তেমনিভাবে মঙ্গলের মধ্যেও আমরা ঐশ্বর্যকে দেখতে পাই। নিজের সুখদুঃখ বা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে কোন বীরপুরুষ। যখন সর্বদুঃখ বরণ করেন, তখন তার সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। কারণ এর মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। সৌন্দর্য যেমন উগদ্ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশী প্রকাশ করে মানুষের জীবন মঙ্গল তাই করে থাকে। বস্তুত মঙ্গল আমাদের সর্বাধিক অন্তরতম সৌন্দর্য বলেই অনেক সময় তাকে সহজে সুন্দর বলে বুঝতে পারিনা।

ভোজের আয়োজনে যদি প্রাচুর্য থাকে, এবং সাজসজ্জায় যদি আড়ম্বর থাকে, তবে তা উপভোগ্য হতে পারে কিন্তু এর সঙ্গে যদি যজ্ঞকর্তার হৃদ্যতা যুক্ত না হয়, তবেই সমস্ত বিস্বাদ হয়ে যায়, কারণ হৃদ্যতার মধ্য দিয়েই অন্তরের ঐশী ও প্রাচুর্য প্রকাশিত হয়। ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য এবং সাজ আড়ম্বরের চেয়ে অন্তরের গভীরতা মঙ্গলের অর্থাৎ ভোজের প্রধান অঙ্গ ।এটিকে উপভোগ করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিগণ মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত পরিপূর্ণতার ছবি এঁকেছেন, তাই গতিশী নারীর চিত্রাঙ্কনে তাদের সংকোচ ছিল না, কারণ সেই নারীমূর্তির মধ্যেই নারীর চরম সার্থকতা লাভের আসন্ন চিত্র অর্থাৎ মাতৃত্বের কাপ ফুটে ওঠে। কালিদাস তার ‘মেঘদূত’ কাব্যে শরতের লঘুপক্ষ মেঘ কিংবা বসন্তের মলয় বাতাসকে বার্তা বহনের কার্যে নিযুক্ত না করে বিদ্যুৎগর্ভ মন্থরগতি গুরুভার আষাঢ়ের মেঘকেই গ্রহণ করেছিলেন, কারণ এই মেঘ যে অঞ্চলের উপর দিয়ে যাবে সেখানে কলম্ব ফুটবে, জাসুকুঞ্জ ভরে উঠবে, বলাকা উড়ে চলবে, প্রভৃতি। এতে শুধু কবির সৌন্দরসপিপাসু চিত্তই তৃপ্তি লাভ করেনি, এ যে পৃথিবীর মঙ্গলসাধনেও ব্যাপৃত। কালিদাস কুমারিসকাব্যে অকাল বসন্তের আকস্মিক উৎসবে হর-পার্বতীর মিলন না ঘটিয়ে পার্বতীকে কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ করে। নিয়েছেন, “অভিজ্ঞান শকুন্তলম’

নাটকেও প্রেয়সী যখন জননী হয়েছে, আনুতাপের সঙ্গে যখন ক্ষমা মিলিত হয়েছে, তখনই কবি রাজদম্পতির মিলন ঘটিয়েছেন। দুই কাব্যের কবি শান্তির মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা সাধন করেছেন। সর্বত্রই সৌন্দর্য পরিণতিতে মঙ্গলমধুর গাঢ়রস-সমৃদ্ধ। ফলে পান্তরিত হয়েছে। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের সম্মিলন যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি কখনো ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে জড়িয়ে রাখেন নি। তাই মহামতি অশোকের বৈভবের পরিচয় তার কোন প্রমোদ-উদ্যান কিংবা রাজপ্রাসাদে খুঁজে পাওয়া যায় না—গিরিশিখর কিংবা নির্জন সমুদ্রতটে তার অসংখ্য সৌন্দসৃষ্টির চিহ্ন রেখে গেছেন। মানুষ-রচিত এই সৌন্দর্যবৃহত্তর প্রকৃত সৌন্দর্যকে যেন অভিবাদন জ্ঞাপন করছে। প্রাচীন হিন্দু রাজারাও বিলাস-বৈভবের কোন চিহ্ন রেখে যান নি, কিন্তু তারা মানুষের শক্তিকে ভক্তিকে ভগৱানের মঙ্গলরূপের পার্শ্বে বসিয়ে ধন্য হয়েছেন। বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মীর মিলনের মতোই মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন সাধনা পূর্ণতা লাভ করেছে।

১৪.৪ অনুশীলনী

১।“এইজন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোন কলা বিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।" আলচনা কর

২।সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানব চরিত্র ব্যাখ্যা করো।

৩।সাহিত্যের সামগ্রী কি এবং কি নয় সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যের সামগ্রী’ প্রবন্ধে কি বলেছেন?

৪।সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে ভাব এর বিষয়- আলোচনা করো

৫।“মন প্রকৃতির আরশি নহে সাহিত্য প্রকৃতির আরশি নহে, মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয় সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।” সাহিত্যের বিচার প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা করো।

৬।সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আলোচনা করো।

৭। ‘সৌন্দর্যবোধ’ প্রবন্ধে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের সম্পর্ক উল্লেখ করো।

১৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১।সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ -সত্যেন্দ্রনাথ রায়

২।সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়